# আমার ছেলেবেলা

হুমায়ূন আহমেদ

# আমার ছেলেবেলা

হুমায়ূন আহমেদ

কাকলী প্রকাশনী

©
গুলতেকিন আহমেদ

**সপ্তম মুদ্রণ**
লেখকের ৫০তম জন্মদিনে
বিশেষ মুদ্রণ
১৩ নভেম্বর '৯৮

**ষষ্ঠ মুদ্রণ**
মে ১৯৯৬

**পঞ্চম মুদ্রণ**
ডিসেম্বর ১৯৯৩

**প্রথম প্রকাশ**
ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

**প্রকাশক**
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

**প্রচ্ছদ**
ধ্রুব এষ

**কম্পোজ**
গতিধারা কম্পিউটারস্
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

**মুদ্রণ**
এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন ঢাকা ১১০০

**দাম ৬০ টাকা**

ISBN 984 437 017 5

উৎসর্গ

**বড়মামা শেখ ফজলুল করিম**

যিনি এই পৃথিবীতে খুব অল্প আয়ু নিয়ে এসেছিলেন
সেই অল্প আয়ুর সবটাই খরচ করে গেলেন আমাদের পেছনে।

## তৃতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

সিলেটের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী জনাব লিয়াকত হোসেন সাহেব 'আমার ছেলেবেলা'য় উল্লিখিত শুক্লাদি এবং মাথামোটা শংকর সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। আমি তাঁর চিঠি থেকে সেই অংশ হুবহু তুলে দিলাম ঃ

> "**শুক্লাদি ঃ** মীরা বাজারের এস. কে. রায় চৌধুরী–এর বড় কন্যা শুক্লা রায় চৌধুরী ভারতে অধ্যয়নকালে অকাল মৃত্যুবরণ করেন। তিনি এম. সি. কলেজের রসায়ন বিভাগ-এর বিভাগীয় প্রধানের মেয়ে ছিলেন। তিনি ১৯৫৪-তে সিলেট গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। তাঁর বড় ভাই সাধন ১৯৬১-তে পাটনায় অকাল মৃত্যুবরণ করেন এবং অধ্যাপক রায় চৌধুরী ১৯৭১-এর কিছুদিন আগে আসামের করিমগঞ্জে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ওঁদের পরিবারের সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল। বর্তমানে রত্না, শংকর ও মানস ভারতে চাকুরি করছে। ঐ বাড়ি লতিফ চৌধুরী নামে একজন ব্যবসায়ী কিনেছেন। তিনিও আমার খুব পরিচিত। আপনার দেওয়া বাড়ির বর্ণনা ঠিক আছে—হিন্দুবনেদী বাড়ি গাছপালা বেষ্টিত থাকতো।
>
> **মাথামোটা শংকর ঃ** আপনার ক্লাসমেট শংকর তার ছাত্রজীবন ইতি দিয়ে মাদ্রাসা মাঠে মোটা মাথা নিয়ে বাদাম বিক্রি করতো। জানি না এখন কোথায় আছে। মীরা বাজারের কারো সঙ্গে দেখা হলে তার খবর জানতে পারবো। নতুন খবর জানলে আপনাকে জানাবার ইচ্ছা রাখি।"

হুমায়ূন আহমেদ
শহীদুল্লাহ হল
৫. ১০. ৯১

## কাকলী কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

দ্বৈরথ
হোটেল গ্রেভার ইন
সমুদ্রবিলাস
গৌরীপুর জংশন
ভূত ভূতং ভূতৌ
গল্প সমগ্র
নি
স্বনির্বাচিত উপন্যাস
কোথাও কেউ নেই
জনম জনম
কিশোর সমগ্র
তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে
অনন্ত নক্ষত্র বিথী
কোয়ান্টাম রসায়ন
এই আমি
আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই
সকল কাঁটা ধন্য করে
অনন্ত অম্বরে
কবি
হিমুর দ্বিতীয় প্রহর
গৃহত্যাগী জোছনা
মীরার গ্রামের বাড়ী

## ভূমিকা

এক দুপুরে ভাত খেতে বসেছি। আমার মেজো মেয়ে কী-একটা দুষ্টুমি করায় মা'র কাছে বকা খেয়েছে। মুখ অন্ধকার করে ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসে আছে। অনেক সাধাসাধি করেও তাকে খাওয়ানো যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, মা, তোমাকে আমি আমার ছেলেবেলার একটা গল্প বলব। গল্প শুনে তুমি যদি হেসে ফেলো তা হলে কিন্তু ভাত খেতে হবে।

আমি গল্প শুরু করলাম। সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল না হাসার। শেষ পর্যন্ত খিলখিল করে হেসে ফেলে বলল, তুমি যদি তোমার ছেলেবেলার আরেকটা গল্প বল তা হলে ভাত খাব।

আমি যে একসময় তাদের মতো ছোট ছিলাম এবং খুব দুষ্ট ছিলাম এই বিস্ময়ই তাদের জন্যে যথেষ্ট। তার সঙ্গে যুক্ত হল মজার মজার ঘটনা। ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে মনে হল ছেলেবেলাটা লিখে ফেললে কেমন হয়। বিশ-পঁচিশ পৃষ্ঠা লিখেও ফেললাম। আমার বড় মেয়ে খুব উৎসাহ নিয়ে সেই পাণ্ডুলিপি আমার মাকে পড়াল। মা'র মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি শীতল গলায় আমাকে বললেন, এইসব কী লিখেছিস? নিজের আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে রসিকতা?

আমার ছোট বোনও পাণ্ডুলিপি পড়ল। সে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, আমাকে নিয়ে মাকড়সা প্রসঙ্গে যে গল্পটা লিখেছ ঐটা কেটে দাও। লোকে কী ভাববে? পাণ্ডুলিপির খবর ছড়িয়ে পড়ল। আমার ছোটমামা খুলনা থেকে চলে এলেন পড়ার জন্যে। তিনি পড়লেন এবং কোনো কথা না বলে খুলনা চলে গেলেন। বুঝলাম তাঁরও পছন্দ হয়নি। তবু একসময় শেষ করলাম এবং কোথাও কোনো ভুলটুল আছে কি না তা যাচাই করবার জন্য নিজেই নানিজানকে পড়ে শোনালাম।

নানিজান বললেন, অনেক ভুলভ্রান্তি আছে। এই ধর, তুই লিখলি তোর মা পাগল হয়ে গিয়েছিল। পাগল হবে কীজন্যে? মানুষ চিনত না। উলটাপালটা কথা বলত—এর বেশি তো কিছু না। এটাকে পাগল বলে?

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। আমার মেজো মেয়ে বলল, তুমি মন-খারাপ করছ কেন? লেখাটা তো মোটামুটি ভালোই হয়েছে। তবে তুমি একটা জিনিস লিখতে ভুলে গেছ।

কোন জিনিস মা?

ছেলেবেলায় দুধ আর ডিম খেতে তোমার কেমন খারাপ লাগত তা তো লেখনি।

দুধ ডিম তো মা তোমরা খাচ্ছ। আমরা খেতে পারিনি। এত পয়সা আমার বাবা-মা'র ছিল না।

মেজো মেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, আহা কী সুখের ছিল তোমাদের ছেলেবেলা!

হ্যাঁ, সুখেরই ছিল।

সেই সুখের খানিকটা ভাগ আজকের পাঠক-পাঠিকাদের দেয়ার জন্যেই এই লেখা। ছেলেবেলা লেখার সময় শৈশবে ফিরে গিয়েছিলাম। যতক্ষণ লিখেছি গভীর আনন্দে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। পেছনে ফিরে তাকানো যে এত আনন্দময় হবে কে জানত?

হুমায়ূন আহমেদ

# শোনা কথা

মানুষ অসম্ভব স্মৃতিধর।

নব্বই বছরের একজন মানুষও তার ছেলেবেলার কথা মনে করতে পারে। মস্তিষ্কের অযুত নিযুত নিওরোনে বিচিত্র প্রক্রিয়ায় স্মৃতি জমা হয়ে থাকে। কিছুই নষ্ট হয় না। প্রকৃতি নষ্ট হতে দেয় না। অথচ আশ্চর্য, অতি শৈশবের কোনো কথা তার মনে থাকে না। দুবছর বা তিন বছর বয়সের কিছুই সে মনে করতে পারে না। মাতৃগর্ভের কোনো স্মৃতি থাকে না, জন্মমুহূর্তের কোনো স্মৃতিও না। জন্মসময়ের স্মৃতিটি তার থাকা উচিত ছিল। এত বড় একটা ঘটনা অথচ এই ঘটনার স্মৃতি প্রকৃতি মুছে ফেলে। মনে হয় প্রকৃতির কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য এতে কাজ করে। প্রকৃতি হয়তো চায় না পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা আমরা মনে করে রাখি।

আমি যখন মন ঠিক করে ফেললাম ছেলেবেলার কথা লিখব, তখন খুব চেষ্টা করলাম জন্মমুহূর্তের স্মৃতির কথা মনে করতে এবং তারও পেছনে যেতে, যেমন মাতৃগর্ভ। কেমন ছিল মাতৃগর্ভের সেই অন্ধকার? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করল। এল এস ডি (Lysergic acid dietlyamide) নামের একধরনের ড্রাগ নাকি মাতৃগর্ভ এবং জন্মমুহূর্তের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। আমেরিকা থাকাকালীন এই ড্রাগের খানিকটা জোগাড় করেছিলাম। সাহসের অভাবে খেতে পারিনি। কারণ এই হেলুসিনেটিং ড্রাগ প্রায়ই মানুষের মানসিক অবস্থায় বড় রকমের ঢেউ তোলে।

আসল ব্যাপার হচ্ছে, খুব পুরানো কথা আমার কিছুই মনে নেই। তবে জন্মের চার বছরের পর থেকে অনেক কিছুই আমি মনে করতে পারি। সেইসব কথাই লিখব। শুরুটা করছি শোনা কথার উপর নির্ভর করে। শোনা কথার উপর নির্ভর করাও বেশ কঠিন। একই গল্প একেক জন দেখি একেক রকম করে বলেন। যেমন একজন বললেন, 'তোমার জন্মের সময় খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল।' অন্য একজন বললেন, 'কই না তো, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিল এইটা খেয়াল আছে, ঝড়বৃষ্টি তো ছিল না!'

আমি সবার কথা শুনে শুনে একটি ছবি দাঁড় করিয়েছি। এই ছবি খানিকটা এদিক-ওদিক হতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি এমন কেউ না যে

আমার জন্মমুহূর্তের প্রতিটি ঘটনা হুবহু লিখতে হবে। কোনো ভুলচুক করা যাবে না। থাকুক কিছু ভুল। আমাদের জীবনের একটা বড় অংশ জুড়েই তো আছে ভুল এবং ভ্রান্তি।

আমার জন্ম ১৩ই নভেম্বর। ১৯৪৮ সন। শনিবার, রাত ১০টা তিরিশ মিনিট। শুনেছি ১৩ সংখ্যাটাই অশুভ। এই অশুভের সঙ্গে যুক্ত হল শনিবার। শনি-মঙ্গলবারও নাকি অশুভ। রাতটাও কৃষ্ণপক্ষের। জন্মমুহূর্তে দপ করে হারিকেন নিভে গেল। ঘরে রাখা গামলার পানি উলটে গেল। একজন ডাক্তার, যিনি গত তিনদিন ধরে মা'র সঙ্গে আছেন, তিনি টর্চলাইট জ্বেলে তার আলো ফেললেন আমার মুখে। ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, এই জানোয়ারটা দেখি তার মাকে মেরেই ফেলছিল!

আমি তখন গভীর বিস্ময়ে টর্চলাইটের ধাঁধানো আলোর দিকে তাকিয়ে আছি। চোখ বড় বড় করে দেখছি—এসব কী? অন্ধকার থেকে এ আমি কোথায় এলাম?

জন্মের পরপর কাঁদতে হয়। তা-ই নিয়ম।

চারপাশের রহস্যময় জগৎ দেখে কাঁদতেও ভুলে গেছি। ডাক্তার সাহেব আমাকে কাঁদাবার জন্য ঠাশ করে গালে চড় বসালেন। আমি জন্মমুহূর্তেই মানুষের হৃদয়হীনতার পরিচয় পেয়ে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে লাগলাম। ঘরে উপস্থিত আমার নানিজান আনন্দিত স্বরে বললেন, 'বামুন রাশির ছেলে'। বামুন রাশি বলার অর্থ প্লেসেন্টার সঙ্গে যুক্ত রক্তবাহী শিরাটি বামুনের পৈতার মতো আমার গলা পেঁচিয়ে আছে।

শিশুর কান্নার শব্দ আমার নানাজানের কানে যাওয়ামাত্র তিনি ছুটে এসে বললেন, ছেলে না মেয়ে?

ডাক্তার সাহেব রহস্য করবার জন্যে বললেন, মেয়ে, মেয়ে। ফুটফুটে মেয়ে।

নানাজান তৎক্ষণাৎ আধমণ মিষ্টি কিনতে লোক পাঠালেন। যখন জানলেন মেয়ে নয় ছেলে—তখন আবার লোক পাঠালেন—আধমণ নয়, এবার মিষ্টি আসবে একমণ। এই সমাজে পুরুষ এবং নারীর অবস্থান যে ভিন্ন তাও জন্মলগ্নেই জেনে গেলাম।

নভেম্বর মাসের দুর্দান্ত শীত।

গারো পাহাড় থেকে উড়ে আসছে অসম্ভব শীতল হাওয়া। মাটির মালশায় আগুন করে নানিজান সেঁক দিয়ে আমাকে গরম করার চেষ্টা করছেন।

আশেপাশের বৌ-ঝি'রা একের পর এক আসছে এবং আমাকে দেখে মুগ্ধ গলায় বলছে—'সোনার পুতলা।'

এতক্ষণ যা লিখলাম সবই শোনা কথা। মা'র কাছ থেকে শোনা। কিন্তু আমার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ আমি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের মানুষ। আমাকে দেখে সোনার পুতলা বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার কিছু নেই। তা ছাড়া জন্মমুহূর্তের এতসব কথা আমার মা'রও মনে থাকার কথা নয়। তাঁর তখন জীবন- সংশয়। প্রসববেদনায় পুরো তিনদিন কাটা মুরগির মতো ছটফট করেছেন। অতিরিক্ত রকমের রক্তক্ষরণ হচ্ছে। পাড়াগাঁর মতো জায়গায় তাঁকে রক্ত দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থাতেও তিনি লক্ষ্য করছেন, তাঁর সোনার পুতলা গভীর বিস্ময়ে চারপাশের পৃথিবীকে দেখছে, কাঁদতে ভুলে গেছে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার ধারণা, মা যা বলেছেন তা অন্যদের কাছ থেকে শুনেই বলেছেন।

ধরে নিচ্ছি, মা যা বলেছেন সবই সত্যি। ধরে নিচ্ছি, একসময় আমার গাত্রবর্ণ কাঁচা সোনার মতো ছিল। ধরে নিচ্ছি, আমার জন্মের আনন্দপ্রকাশের জন্য সেই রাতে একমণ মিষ্টি কিনে বিতরণ করা হয়েছিল। মিষ্টি কেনার অংশটি বিশ্বাসযোগ্য। নানাজানের অর্থবিত্ত তেমন ছিল না, কিন্তু তিনি দিলদরিয়া ধরনের মানুষ ছিলেন। আমার মা ছিলেন তাঁর সবচে আদরের প্রথমা কন্যা, বিয়ে হয়ে যাবার পরও যে-কন্যার মাথার চুল তিনি নিজে পরম যত্নে আঁচড়ে দিতেন। এই অতি আদরের কন্যার বিয়ের সময়ও তিনি জমিটমি বিক্রি করে খরচের চূড়ান্ত করলেন। পিতৃহৃদয়ের মমতা প্রকাশ করলেন দুহাত খুলে টাকা খরচের মাধ্যমে।

উদাহরণ দিই—মোহনগঞ্জ স্টেশন থেকে বর আসবে, হাঁটাপথে পাঁচ মিনিটের রাস্তা। পালকির ব্যবস্থা করলেই হয়। আমার নানাজান হাতির ব্যবস্থা করলেন। সুসং দুর্গাপুর থেকে দুটি হাতি আনানো হল। যে-লোক এই কাজ করতে পারেন, তিনি তাঁর প্রিয় কন্যার প্রথম সন্তানজন্মের খবরে বাজারের সমস্ত মিষ্টি কিনে ফেলতে পারেন।

আমার বাবা তখন সিলেটে। বিশ্বনাথ থানার ওসি।

ছেলে হবার খবর তাঁর কাছে পৌঁছল। তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বেচারার খুব শখ ছিল প্রথম সন্তানটি হবে মেয়ে। তিনি মেয়ের নাম ঠিক করে বসে আছেন। একগাদা মেয়েদের ফ্রক বানিয়েছেন। রুপার মল বানিয়েছেন। তাঁর মেয়ে মল পায়ে দিয়ে ঝমঝম করে হাঁটবে—তিনি মুগ্ধ হয়ে দেখবেন। ছেলে হওয়ায় সব পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল। তিনি একগাদা ফ্রক ও রুপার মল নিয়ে ছেলেকে দেখতে গেলেন। পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এইসব মেয়েলি

পোশাক আমাকে দীর্ঘদিন পরতে হয়। বাবাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মা আমার মাথার চুলও লম্বা রেখে দেন। সেই বেণি-করা চুলে রংবেরঙের রিবন পরে আমার শৈশবের শুরু।

বাবা-মা'র প্রথম সন্তান হচ্ছে চমৎকার একটি জীবন্ত খেলনা। এই খেলনার সবই ভালো। খেলনা যখন হাসে, বাবা-মা হাসেন। খেলনা যখন কাঁদে, বাবা-মা'র মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। আমার বাবা-মা'র ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না। তাঁরা তাঁদের শিশুপুত্রের ভেতর নানান প্রতিভার লক্ষণ দেখে বারবার চমৎকৃত হলেন। হয়তো আমাকে চাবি-দেয়া একটা ঘোড়া কিনে দেয়া হল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ভেঙে ফেললাম। আমার বাবা পুত্রপ্রতিভায় মুগ্ধ। হাসিমুখে বললেন, দ্যাখো দ্যাখো, ছেলের কী কৌতূহল! সে ভেতরের কলকবজা দেখতে চায়।

হয়তো আমাকে খাওয়ানোর জন্য মা থালায় করে খাবার নিয়ে গেলেন, আমি সেই থালা উড়িয়ে ফেলে দিলাম। বাবা আমার প্রতিভায় মুগ্ধ—দ্যাখো দ্যাখো, ছেলের রাগ দ্যাখো। রাগ থাকা ভালো। এই যে থালা সে উড়িয়ে ফেলে দিল এতে প্রমাণিত হল তার পছন্দ-অপছন্দ দুটিই খুব তীব্র।

এই সময় বই ছিঁড়ে ফেলার দিকেও আমার ঝোঁক দেখা গেল। হাতের কাছে বই পাওয়ামাত্র টেনে ছিঁড়ে ফেলি। এর মধ্যেও বাবা আমার প্রতিভার লক্ষণ দেখতে পেলেন। তিনি মা'কে বোঝালেন—এই যে সে বই ছিঁড়ছে, তার কারণ বইয়ের লেখা সে পড়তে পারছে না, বুঝতে পারছে না। যে-জিনিস সে বুঝতে পারছে না সেই জিনিস সে নষ্ট করে দিচ্ছে। এটি প্রতিভার লক্ষণ।

আদরে বাঁদর হয়।

আমি পুরোপুরি বাঁদর হয়ে গেলাম। এবং আমার প্রতিটি বাঁদরামিতে প্রতিভার লক্ষণ দেখে আমার বাবা-মা বারবার চমৎকৃত হতে লাগলেন। বাবা-মা'র সঙ্গে যুক্ত হলেন বাবার এক বন্ধু গনি সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী। এই নিঃসন্তান দম্পতি তাঁদের বুভুক্ষু হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা আমার জন্যে ঢেলে দিলেন। তাঁদের ভালোবাসার একটা ছোট্ট নমুনা দিচ্ছি। একদিন বেড়াতে এসে দেখেন আমি চামচে করে চিনি খাচ্ছি। গনি চাচা বললেন, আরে এ তো আগ্রহ করে চিনি খাচ্ছে! চিনি খেতে পছন্দ করে তা তো জানতাম না! তিনি তৎক্ষণাৎ বের হয়ে গেলেন। ফিরে এলেন পাঁচ সের চিনি নিয়ে। মেঝেতে পাটি পেতে আমাকে বসিয়ে দিলেন। আমার চারদিকে চিনি ছড়িয়ে দেয়া হল। গনি চাচা হৃষ্টচিত্তে বললেন, খা ব্যাটা, কত চিনি খাবি খা।

আমাকে ঘিরে বাবা-মা'র আনন্দ স্থায়ী হল না। আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কালান্তক জ্বর। টাইফয়েড। তখন টাইফয়েডের অষুধ বাজারে

আসেনি। রুগিকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কিছুই করণীয় নেই। যতই দিন যেতে লাগল মা'র শরীর ততই কাহিল হতে থাকল। একসময় দেখা গেল তিনি কাউকে চিনতে পারছেন না। এক গভীর রাতে বাবাকে ঘুম ভাঙিয়ে অত্যন্ত অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আমার পাশে এই যে ছোট্ট ছেলেটা শুয়ে আছে, এ কে?

বাবা হতভম্ব হয়ে গেলেন। মা বললেন, এই ছেলেটা এখানে কেন? এ কার ছেলে?

আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হল নানাজানের কাছে। সিলেটের বিশ্বনাথ থেকে ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জে। পিতৃমাতৃ স্নেহ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে আমার দ্বিতীয় জীবন শুরু হল। আমার নানিজান আমাকে লালনপালনের ভার গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর একটি মেয়ে হয়েছে। তাঁর এক কোলে সেই মেয়ে, অন্য কোলে আমি। নানিজানের বুকের দুধ খেয়ে দুজন একসঙ্গে বড় হচ্ছি।

দুমাস জ্বরে ভোগার পর মা সেরে উঠলেন কিন্তু টাইফয়েড তার প্রবল থাবা বসিয়ে গেল। মা'র মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা গেল। কাউকে চেনেন না। যার সঙ্গে দেখা হয় তাঁকেই বলেন, কত টাকা লাগবে তোমার বলো তো! আমার কাছে অনেক টাকা আছে। যত টাকা চাইবে ততই পাবে। ফেরত দিতে হবে না।

বলেই তোশকের নিচ থেকে লক্ষ লক্ষ কাল্পনিক টাকা বের করতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে এইসব কাল্পনিক টাকা জানালা দিয়ে উড়িয়ে দেন। চিকন স্বরে চেঁচিয়ে বলেন, টাকা নিয়ে যাও। টাকা। আমি টাকা উড়াচ্ছি। যার যত দরকার, নাও। ফেরত দিতে হবে না।

মা বিয়ের পর খুব কষ্টে পড়েছিলেন। টাকাপয়সার কষ্ট। বিশ্বনাথ থানার ওসি হিসেবে বাবার বেতন ছিল আশি টাকা। বেতনের এই আশিটি টাকা বাবা তাঁর খামখেয়ালি স্বভাবের জন্য অতি দ্রুত খরচ করে ফেলতেন। মাসের দশ তারিখেই বাবার হাতে একটা পয়সা নেই। থানার ওসিদের টাকাপয়সার অভাব হবার কথা না। কিন্তু আজ লিখতে গিয়ে গর্ব এবং অহংকারে বুক ভরে যাচ্ছে যে আমার বাবা ছিলেন সাধু প্রকৃতির মানুষ। বেতনের টাকাই ছিল তাঁর একমাত্র রোজগার। মা'র কাছে শুনেছি, পুলিশের রেশনই তাঁদের বাঁচিয়ে রাখত। মাসের প্রথমেই রেশন তোলা হত। রেশনে চাল, ডাল এবং তেল পাওয়া যেত। সারা মাসে তাঁদের খাবারের মেনু ছিল ডাল, ডালের বড়া এবং নিমপাতা ভাজা। বাসার সঙ্গে লাগোয়া একটা নিমগাছ ছিল। সেই নিমের কচি পাতা ভাজা করা হত। মাকে শাড়ি কিনে দেবার সামর্থ্য বাবার ছিল না। মা'র শাড়ি পাঠাতেন

নানাজান। সতেরো বছরের একটি মেয়ে, যে মোটামুটি সচ্ছলতায় মানুষ হয়েছে, তার জন্য এই অর্থকষ্ট বড়ই ভয়াবহ ছিল। অর্থনৈতিক পীড়ন তাঁর উপর যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল মানসিক বিকৃতির সময় তা-ই ফুটে বের হল। যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই মা এক লাখ বা দুলাখ টাকা দিয়ে দেন।

দুবছর এমন করেই কাটল। আমি নানিজানের কাছে। মা বাবার সঙ্গে সিলেটে। পুরোপুরি পাগল একজন মানুষ।

এক শ্রাবণ মাসের রাতে মা'র ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে ঝুম বৃষ্টি। হাওয়ায় বাড়ি যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির পেছনের-ঝাঁকড়া জামগাছে শোঁশোঁ শব্দ হচ্ছে। মা বাবাকে ডেকে তুলে ভয়ার্ত স্বরে বললেন, বাতি জ্বালাও, ভয় লাগছে।

বাবা চমকে উঠলেন। দিব্যি সুস্থ মানুষের মতো কথাবার্তা।

হারিকেন জ্বালানো হল। মা তীব্র স্বরে বললেন, আমার ছেলে কোথায়?

বাবা তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মন আশা-নিরাশায় দুলছে। তা হলে কি মাথা ঠিক হয়ে গেল?

কথা বলছ না কেন? আমার ছেলে কোথায়?

আয়েশা, তোমার কি সবকিছু মনে পড়ছে?

আমার ছেলে কোথায়?

ও আছে। ও ভালো আছে, তোমার মা'র কাছে আছে। তুমি দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে ছিলে। তাকে পাঠিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তুমি শান্ত হও, কাল ভোরেই তোমাকে নিয়ে আমি মোহনগঞ্জ রওনা হব।

আমি অসুস্থ ছিলাম?

হ্যাঁ।

মা উঠে গিয়ে একটা আয়না আনলেন। আয়নায় নিজেকে দেখে চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। মাথাভরতি চুল ছিল। কোনো চুল নেই। দাঁতের রং কুচকুচে কালো। আয়নায় যার ছায়া পড়েছে সে উনিশ বছরের তরুণী নয়, যেন ষাট বছর বয়সের এক বৃদ্ধা।

আয়েশা, তোমার কি সব মনে পড়ছে?

হ্যাঁ।

বলো তো কত তারিখে আমাদের বিয়ে হয়েছিল?

আষাঢ় মাসে। পয়লা আষাঢ়।

আনন্দে বাবার চোখও ভিজে উঠল।

বাইরে ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি। ঘরে নিবুনিবু হারিকেনের রহস্যময় আলো।

সেই আলোয় মূর্তির মতো বসে আছেন পুত্রবিরহকাতর এক মা, যিনি এই কিছুক্ষণ আগে তাঁর হারানো স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন।

বাবা মাকে নিয়ে মোহনগঞ্জ উপস্থিত হলেন। আমাকে মা'র কোলে বসিয়ে দেয়া হল। মা বিস্মিত হয়ে বললেন, এই কি আমার ছেলে?

নানিজান বললেন, হ্যাঁ।

ছেলে এত বড় কেন?

ছেলের বয়স দুই বছর, বড় হবে না?

কথা বলতে পারে?

পারে, সব কথা বলতে পারে।

মা নানিজানের দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বললেন, আমার ছেলের কোনো অনাদর হয়নি তো?

নানিজান হেসে ফেললেন।

আমার ছেলের সোনার মতো গায়ের রং ছিল। ও এত কালো হল কেন?

সারাদিন রোদে রোদে ঘোরে।

কেন, আপনারা দেখেন না? কেন আমার ছেলে সারাদিন রোদে রোদে ঘোরে?

মা যতই রাগ করেন সবাই তত হাসে।

বাড়িভরতি মানুষ। মাতা-পুত্রের মিলনদৃশ্য দেখতে পাড়া ভেঙে বৌ-ঝি'রা এসেছে। আমার নানাজান আবার একমণ মিষ্টি কিনতে লোক পাঠিয়েছেন।

আসরের মধ্যমণি হয়ে আমার মা একটা জলচৌকিতে আমাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এই তাঁর মুখে তৃপ্তি, এই তাঁর চোখে জল। মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলছে। পৃথিবীর মধুরতম একটি দৃশ্য সবাই দেখছে মুগ্ধ হয়ে। এর মধ্যে মা সবাইকে সচকিত করে একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা করলেন। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, 'আমার এই ছেলের শৈশব বড় কষ্টে কেটেছে, আল্লাহ, তার বাকি জীবনটা তুমি সুখে সুখে ভরে দিও। বাকি জীবনে সে যেন কোনো দুঃখ না পায়।'

ঈশ্বর মা'র এই প্রার্থনা গ্রহণ করেননি। এই ক্ষুদ্র জীবনে আমি বারবার দুঃখ পেয়েছি। বারবার হৃদয় হা-হা করে উঠেছে। চারপাশের মানুষদের নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতায় আহত হয়ে কতবার মনে হয়েছে—এই পৃথিবী বড়ই বিষাদময়! আমি এই পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোনো পৃথিবীতে যেতে চাই, যে-পৃথিবীতে মানুষ নেই। চারপাশে পত্রপুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি। আকাশে চিরপূর্ণিমার চাঁদ, যে-চাঁদের ছায়া পড়েছে ময়ূরাক্ষী নামের এক নদীতে। সেই নদীর স্বচ্ছ জলে সারাক্ষণ খেলা করে জোছনার ফুল। দূরের বন থেকে ভেসে আসে অপার্থিব সংগীত।

মা আমাকে নিয়ে সিলেটে চলে এলেন। কিছুদিন তাঁর নিশ্চয়ই খুব সুখে কাটল। কোনো সুখই স্থায়ী হয় না। এই সুখও স্থায়ী হল না, আবার টাইফয়েড হল। টাইফয়েডের বীজ হয়তো লুকিয়ে ছিল। প্রাণসংহারক মূর্তিতে সে আবার আত্মপ্রকাশ করল। বাবা দিশাহারা হয়ে পড়লেন। মা সারাদিন প্রবল জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে এলে ব্যাকুল হয়ে তাঁর শিশুপুত্রকে খোঁজেন। সেই শিশুকে তাঁর কাছে যেতে দেয়া হয় না। মা কাকুতি-মিনতি করেন, ওকে একটু দেখতে দাও। একবার শুধু দেখব।

কাজের মেয়ে আমাকে নিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। মা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন। গভীর বিষাদ এবং গভীর আনন্দে তাঁর চোখে জল আসে।

এর মধ্যেই একদিন ডাক্তার সাহেব বাবাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনার স্ত্রী বাঁচবেন না। আপনি মানসিকভাবে এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

বাবা বললেন, কোনো আশাই কি নেই?

না। টাইফয়েড দ্বিতীয়বার হলে আর রক্ষা নেই, তবে ...

তবে কী?

টাইফয়েডের নতুন একটা অষুধ বাজারে এসেছে। শুনেছি অষুধটা কাজ করে। ইন্ডিয়াতে হয়তোবা পাওয়া যায়। আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

আসামের শিলচরে বাবা লোক পাঠালেন। অষুধ পাওয়া গেল না। বাবা স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সেই প্রস্তুতির প্রমাণ হচ্ছে আমার নামকরণ। আমার নাম রাখলেন কাজল। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর অপুর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। অপুর ছেলের নাম ছিল কাজল। আমার ভালো নাম রাখা হল শামসুর রহমান। বাবার নাম ফয়জুর রহমান। বাবার নামের সঙ্গে মিলিয়ে ছেলের নাম। ছয় বছর বয়স পর্যন্ত আমাকে শামসুর রহমান নাম নিয়ে চলাফেরা করতে হল। সপ্তম বছরে বাবা হঠাৎ সেই নাম বদলে রাখলেন হুমায়ূন আহমেদ। বছর দুই হুমায়ূন আহমেদ নামে চলার পর আবার আমার নাম বদলে দেবার ব্যবস্থা হল। আমি কঠিন আপত্তি জানালাম। বারবার নাম বদলানো চলবে না। আমাদের সব ভাইবোনই প্রথম ছ'সাত বছর এক নাম, তারপর অন্য নাম। আমার বাবার মৃত্যুর পর তাঁর পেনশন এবং গ্র্যাচুইটির টাকাপয়সা তুলতে গিয়ে বিরাট যন্ত্রণায় পড়লাম। দেখা গেল, তিনি তাঁর টাকাপয়সা তাঁর স্ত্রী এবং তিন ছেলেমেয়েকে দিয়ে গেছেন। কিন্তু তিন ছেলেমেয়ের যে নাম লিখে রেখে গেছেন, এখন কারওরই সেই নাম নেই। বাবা তাঁর ছেলেমেয়ের নাম বদলেছেন। কিন্তু কাগজপত্র ঠিকঠাক করতে ভুলে গেছেন।

আমি এখন আমার বিচিত্র বাবা সম্পর্কে বলব। মৃত্যুপথযাত্রী মা'র প্রসঙ্গটা আপাতত থাক। শুধু এইটুকু বলে রাখি, তিনি দ্বিতীয়বার টাইফয়েডের ধাক্কাও সামলে ওঠেন জনৈক হিন্দু সাধুবাবার ফুঁ-দেয়া তার্পিন তেল খেয়ে। নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তার্পিন টাইফয়েডের অষুধ নয়। নিশ্চয়ই অন্য কোনো ব্যাপার আছে। আমি যা শুনেছি তা-ই লিখলাম। সাধুবাবার ফুঁ-দেয়া তার্পিন খেয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে কেউ ফিরে আসবে এই তথ্য হজম করা আমার পক্ষে বেশ কঠিন। যেহেতু মা দাবি করছেন, সেহেতু লিখছি।

এবার বাবার কথা বলি।

## একজন অদ্ভুত বাবা

আমার ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল তার লেখা প্রথম গ্রন্থ 'কপোট্রনিক সুখ দুঃখে'র উৎসর্গপত্রে লিখেছে ঃ

'পৃথিবীর সবচে ভালমানুষটিকে বেছে নিতে বললে
আমি আমার বাবাকে বেছে নেব।'

বইয়ের উৎসর্গপত্রে লেখকরা সবসময় আবেগের বাড়াবাড়ি করেন। আমার ভাইয়ের এই উৎসর্গপত্র আবেগপ্রসূত ধরে নিতে খানিকটা অসুবিধা আছে। সে যদি লিখত পৃথিবীর সবচে ভালো মানুষ আমার বাবা এবং মা তা হলে আবেগের ব্যাপারটি চলে আসত। সে তা না করে বাবার কথাই লিখেছে। পৃথিবীর সবচে ভালোমানুষের মধ্যে মা'কে ধরেনি। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে তার উৎসর্গপত্র আবেগপ্রসূত নয়। চিন্তাভাবনা করে লেখা। ইকবালকে আমি যতটুকু চিনি সে চিন্তাভাবনা না করে কখনো কিছু বলে না এবং লেখেও না।

আমার বাবা পৃথিবীর সবচে ভালো মানুষদের একজন কি না তা জানি না, তবে বিচিত্র একজন মানুষ, তা বলতে পারি। তাঁর মতো খেয়ালি, তাঁর মতো আবেগবান মানুষ এখন পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। আবেগ ছাড়াও তাঁর চরিত্রে আরও সব বিস্ময়ের ব্যাপারও ছিল। তিনি ছিলেন জন স্টেইনবেকের উপন্যাস থেকে উঠে-আসা এক রহস্যময় চরিত্র।

সবার আগে ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। রাত প্রায় বারোটা। রঙমহল সিনেমা হল থেকে সেকেন্ড শো ছবি দেখে বাবা এবং মা রিকশা করে ফিরছেন। বড় একটা দিঘির পাশ দিয়ে রিকশা যাচ্ছে। মা হঠাৎ বললেন, আহা দ্যাখো কী সুন্দর দিঘি! টলটল করছে পানি। ইচ্ছে করছে পানিতে গোসল করি।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, রিকশা থামাও।

রিকশাওয়ালা থামল।

বাবা বললেন, চলো দিঘিতে গোসল করি।

মা হতভম্ব। এই গভীর রাতে দিঘিতে নেমে গোসল করবেন কী? নিতান্ত পাগল না হলে কেউ এরকম বলে?

মা বললেন, কী বলছ তুমি!

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, দ্যাখো আয়েশা, একটাই আমাদের জীবন। এই এক- জীবনে আমাদের বেশির ভাগ সাধই অপূর্ণ থাকবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেসব সাধ আছে, যা মেটানো যায় তা মেটানোই ভালো। তুমি আসো আমার সঙ্গে।

বাবা হাত ধরে মা'কে নামালেন। স্তম্ভিত রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে দেখল হাত- ধরাধরি করে দুজন নেমে গেল দিঘিতে।

এই গল্প যতবার আমার মা করেন ততবার তাঁর চোখে পানি এসে যায়। তাঁর নিজের ধারণা, তাঁর জীবনে যে অল্প কিছু শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এসেছিল ঐ দিঘিতে অবগাহন তার মধ্যে একটি।

বাবার চরিত্রকে স্পষ্ট করার জন্যে আরও কিছু ঘটনার উল্লেখ করি। বাবা তখন সিলেট সদরে পুলিশের ইন্টেলিজেন্সিতে আছেন। পদমর্যাদায় সাব-ইন্সপেক্টর। বেতন সর্বসাকুল্যে মাসে নব্বুই টাকা। সেই টাকার একটা অংশ দেশের বাড়িতে চলে যায়, এক অংশ ব্যয় হয় বই কেনা বাবদ। বাকি যা থাকে তা দিয়ে অনেক কষ্টে সংসার চালিয়ে নিয়ে যান মা। যাকে বলে ভয়াবহ জীবনসংগ্রাম। জীবনসংগ্রামের এই অংশটি বাবার কখনো চোখে পড়ে না। কারণ দেশের বাড়িতে পাঠানো টাকা এবং বই কেনার টাকা আলাদা করে বাকি টাকাটা মা'র হাতে তুলে দেন। বাবার দায়িত্ব শেষ। বাকি মাস টেনে নিয়ে যাবার দায়িত্ব হচ্ছে মা'র। তিনি তা কীভাবে নেবেন সেটা তাঁর ব্যাপার। বাবার কোনোই মাথাব্যথা নেই।

এইরকম অবস্থায় মাসের প্রথম তারিখে বাবাকে খুব হাসিমুখে বাড়ি ফিরতে দেখা গেল। তিনি বিশ্বজয়-করা হাসি দিয়ে বললেন, আয়েশা, একটা বেহালা কিনে ফেললাম।

মা বিস্মিত হয়ে বললেন, কী কিনে ফেললে?

বেহালা।

বেহালা কীজন্যে?

বেহালা বাজানো শিখব।

কত দাম পড়ল?

দাম সস্তা, সত্তর টাকা। সেকেন্ড হ্যান্ড বলে এই দামে পাওয়া গেল।

বাবা সংসার চালাবার জন্য মা'র হাতে দশটা টাকা তুলে দিলেন। মা হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পেলেন না।

বাবার খুব শখ ছিল ওস্তাদ রেখে তাঁর কাছে বেহালা বাজানো শিখবেন। ওস্তাদকে বেতন দিয়ে বেহালা বাজানো শেখার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। কাজেই অতি যত্নে বেহালা তুলে রাখা হল। যেদিন সামর্থ্য হবে তখন ওস্তাদ রেখে বেহালা শেখা হবে।

মাঝে মাঝে দেখতাম কাঠের বাক্স থেকে তিনি বেহালা বের করছেন। অতি যত্নে ধুলো সরাচ্ছেন। ছড়ে রজন মাখাচ্ছেন এবং একসময় লাজুক ভঙ্গিতে বেহালায় ছড় ঘষছেন। কান্নার মতো একরকম আওয়াজ উঠছে বেহালা থেকে। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছি।

বাবার অসংখ্য অপূর্ণ শখের মতো বেহালা বাজানো শেখার শখও পূর্ণ হয়নি। বাক্সবন্দি থাকতে থাকতে একসময় বেহালার কাঠে ঘুণ ধরে গেল। ছড়ের সুতা গেল ছিঁড়ে। বেহালা চলে এল আমাদের দখলে। আমার ছোট বোন শেফু বেহালার বাক্স দিয়ে পুতুলের ঘর বানাল। বড় চমৎকার হল সেই ঘর। ডালা বন্ধ করে সেই ঘর হাতলে ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়।

আরেক দিনের ঘটনা। শীতকালের এক ভোরে মা'র গলা শুনে ঘুম ভেঙে গেল। কী নিয়ে যেন বাবার সঙ্গে রাগারাগি করছেন। এরকম তো কখনো হয় না! তাঁরা ঝগড়া-টগড়া অবশ্যই করেন, তবে সবটাই চোখের আড়ালে। আজ হল কী? আমি কান পেতে আছি যদি কিছু টের পাওয়া যায়। কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছে না। মা বারবার শুধু বলছেন, ঘোড়া দিয়ে তুমি করবে কী? আমাকে বুঝিয়ে বলো, কে পুষবে এই ঘোড়া?

বাবা বলছেন, এত রাগছ কেন? একটা কোনো ব্যবস্থা হবেই।

মা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, আমরা নিজেরা খেতে পাচ্ছি না, এর মধ্যে ঘোড়া! তোমার কি মাথা-খারাপ হল?

আমি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলাম। কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে একটা ঘোড়া কেনা হয়েছে।

আমাকে জেগে উঠতে দেখে বাবা হাসিমুখে বললেন, ঘরের বাইরে গিয়ে দেখে আয় ঘোড়া কিনেছি।

কী অদ্ভুত কাণ্ড! ঘরের বাইরে সুপারিগাছের সঙ্গে বাঁধা বিশাল এক ঘোড়া। ঘোড়াটাকে আমার কাছে আকাশের মতো বড় মনে হল। সে ক্রমাগত পা দাপাচ্ছে এবং ফোঁসফোঁস করে শব্দ করছে। আমাদের কাজের ছেলে আছদ [তার নাম সম্ভবত আসাদ, সে বলত আছদ] ভীতমুখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘটনা হচ্ছে—বাবা মা'কে না জানিয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডে এ পর্যন্ত জমা সব টাকা তুলে একটা ঘোড়া কিনে ফেলেছেন। এই সেই ঘোড়া। মহাতেজি প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটি প্রাণী, যে-প্রাণীদের সঙ্গে বাবার প্রথম পরিচয় হয় সারদা পুলিশ একাডেমীতে। তাঁর বড়ই পছন্দ হয়। বাবা তাঁর পছন্দের জিনিস যে-করেই হোক জোগাড় করেন। এতদিন পর ঘোড়াও জোগাড় হল। তখন পুলিশ অফিসাররা ব্রিটিশ নিয়মের সূত্র ধরে ঘোড়া পুষলে অ্যালাউন্স পেতেন। বাবা আশা করছেন সেই অ্যালাউন্সের টাকাতেই এর পোষার খরচ উঠে আসবে।

ঘোড়া সুপারিগাছের সঙ্গে বাঁধা। বাবা-মা'র মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হচ্ছে। উত্তাপ পুরোটাই মা-ই চালাচ্ছেন, বাবা শুধু কাটান দেয়ার চেষ্টা করছেন।

কী করবে তুমি এই ঘোড়া দিয়ে শুনি? সিলেট শহরে ঘোড়ায় করে ঘুরবে?

হুঁ। অসুবিধা কী? ছেলেমেয়েদেরও ঘোড়ায় চড়া শেখাব।

ছেলেমেয়েরা ঘোড়ায় চড়া শিখে কী করবে?

কিছু করবে না, একটা বিদ্যা শেখা থাকল।

ঘোড়ার পেছনে কত খরচ হবে সেটা ভেবেছ?

এত ভাবলে বেঁচে থাকা যায় না।

বেঁচে থাকা যাক আর না-যাক এই ঘোড়া তুমি এক্ষুনি বিদেয় করো।

পাগল হয়েছ? এত শখ করে কিনলাম!

বাবা ছিলেন আবেগনির্ভর মানুষ। যুক্তি দিয়ে তাঁকে টলানো মুশকিল। কিন্তু তাঁকেও টলতে হল। কারণ ঘোড়া দ্বিতীয় দিনেই লাথি মেরে আছদের পা ভেঙে ফেলল। মা হাতে অস্ত্র পেয়ে গেলেন। কঠিন গলায় বললেন, তোমার ছেলেমেয়েরা সারাক্ষণ ঘোড়াকে ঘিরে নাচানাচি করে। লাথি খেয়ে ওরা মারা পড়বে। তাই কি তুমি চাও? বাবা ঘোড়া বিক্রি করে দিলেন। সেই টাকায় কিনলেন একটা দামি কোডাক ক্যামেরা। তবে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ঘোড়ার জিন রেখে দিলেন। আমাদের খেলার সামগ্রী-তালিকায় আরেকটি জিনিস যুক্ত হল।

দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জিনিসের প্রতি তাঁর আমৃত্যু শখ ছিল—একটি হচ্ছে পামিস্ট্রি, অন্যটি ফটোগ্রাফি। তাঁর কোডাক ক্যামেরা তিনি আগলে রাখতেন যক্ষের মতো। শুধু যে ছবি তুলতেন তা-ই না, সেই ছবি নিজেই ডেভেলপ এবং প্রিন্ট করতেন। আমার পরিষ্কার মনে আছে, আমাদের শৈশবের আনন্দময় মুহূর্তের একটি হচ্ছে বাবাকে ঘিরে আমরা বসে আছি। একটা গামলায় পানি। সেই পানিতে কিছু কাগজ ভাসছে। ধবধবে সাদা কাগজে আস্তে আস্তে মানুষের মুখের আদল ফুটতে শুরু করেছে। আমরা আনন্দে লাফাচ্ছি। বাবার মুখে আনন্দের হাসি। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগের কথা লিখছি। সেই সময়

পুলিশের একজন দরিদ্র সাব-ইন্সপেক্টর নিতান্তই শখের কারণে ঘরে ডার্করুম বানিয়ে ছবি প্রিন্ট করছেন—ব্যাপারটা বেশ মজার।

পামিস্ট্রি নিয়েও বাবার উৎসাহ ছিল বাড়াবাড়ি রকমের। আমার মনে হয় তাঁর মূল ঝোঁকটা ছিল রহস্যময়তার দিকে। তিনি রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন ফটোগ্রাফিতে, ঝুঁকে পড়েছেন সেদিকে। রহস্য ছিল জ্যোতিষবিদ্যায়, সেদিকেও ঝুঁকলেন।

কিছুদিন পরপরই ছুটির দিনের সকালে একটা আতশি কাচ নিয়ে বসতেন। গম্ভীর গলায় বলতেন, বাবারা আসো তো দেখি, হাতের রেখায় কোনো পরিবর্তন হল কি না।

একবার ইকবালের হাত দেখে বললেন—চমৎকার রেখা। চন্দ্র এবং মঙ্গলের ক্ষেত্রও ভালো। দীর্ঘ আয়ু। তুই খুব কম করে হলেও আশি বছর বাঁচবি। সেই রাতের ঘটনা। ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দে সবার ঘুম ভেঙে গেল। ইকবাল হাউমাউ করে কাঁদছে। কী হয়েছে, কী হয়েছে? সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আশি বছর পর আমি মরে যাব এইজন্যে খুব খারাপ লাগছে আর কান্না পাচ্ছে।

বাবা বললেন, গণনায় ভুল হতে পারে। আরেকবার দেখা দরকার। কই, ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দেখি।

গভীর রাতে বাবা তাঁর আতশি কাচ নিয়ে বসলেন। আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে বসলাম। ইকবালের এক হাত বাবার কাছে, অন্য হাতে সে চোখ কচলাচ্ছে। বাবা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, আগের গণনায় ভুল হয়েছিল। তোর হাতে আছে ইচ্ছামৃত্যুর চিহ্ন। তোর হবে ইচ্ছামৃত্যু।

ইচ্ছামৃত্যু কী?

যতক্ষণ পর্যন্ত মরার ইচ্ছা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুই মরবি না। বেঁচে থাকবি।

কোনোদিন যদি মরার ইচ্ছা না হয়?

তা হলে বেঁচে থাকবি। মরবি না।

ইকবাল হৃষ্টচিত্তে ঘুমুতে গেল।

জ্যোতিষবিদ্যা কোনো বিদ্যা নয়। জ্যোতিষবিদ্যা হচ্ছে একধরনের অপবিদ্যা, অপবিজ্ঞান। মানুষের ভবিষ্যৎ তার হাতের রেখায় থাকে না। থাকার কোনো কারণ নেই। তবু অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বলছি, আমাদের সব ভাইবোন সম্পর্কে তিনি যা বলে গিয়েছিলেন তা মিলে গিয়েছিল। তিনি নিজের মৃত্যু সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর কপালে অপঘাত মৃত্যু লেখা। সেই মৃত্যু হবে ভয়ংকর মৃত্যু।

এইসব তথ্য তিনি হাত দেখে পেয়েছিলেন, না অন্য কোনো সূত্রে পেয়েছিলেন, আমার জানা নেই। মিলগুলি কাকতালীয় বলেই মনে হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরেকটি বিষয়েও জড়িত ছিলেন। সেটাকে প্রেতচর্চা বলা যেতে পারে। প্লানচেট, চক্র, ভূত নামানো এইসব নিয়ে খুব মাতামাতি ছিল। দাদাজান এই নিয়ে বাবার উপর খুব বিরক্ত ছিলেন। তিনি বাবাকে ডেকে তওবা করালেন যাতে তিনি কোনোদিন প্রেতচর্চা না করেন। বাবা তওবার পর প্রেতচর্চা ছেড়ে দেন, তবে এই বিষয়ে বই পড়া ছাড়েননি। বাবার সংগ্রহের বড় অংশ ছিল প্রেতচর্চাবিষয়ক বইপত্র।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, তিনি আস্তিক মানুষ ছিলেন। আমরা কখনো তাঁকে রোজা ভাঙতে দেখিনি। নামাজ খুব নিয়মিত পড়তেন না, তবে রোজ রাতে এশার নামাজে দাঁড় হতেন। গম্ভীর স্বরে সুরা আবৃত্তি করতেন। পরিবেশ হয়ে উঠত রহস্যময়।

আমার বাবা যে একজন রহস্যময় পুরুষ ছেলেবেলায় তা কখনো বুঝতে পারিনি। তখন ধরেই নিয়েছিলাম সবার বাবাই এরকম। আমার বাবা অন্যদের চেয়ে আলাদা কিছু না। তা ছাড়া বাবার সঙ্গে আমাদের কিছু দূরত্বও ছিল। ছেলেমেয়েদের প্রতি আদরের বাড়াবাড়ি তাঁর চরিত্রে ছিল না। নিজে খুব ব্যস্তও থাকতেন। সারাদিন অফিস করে বিকেলে বই পড়তে যেতেন কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে। ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা। দিনের পর দিন কাটত, তাঁর সঙ্গে আমাদের কথা হত না। এই কারণে মনেমনে চাইতাম তাঁর যেন কোনো-একটা অসুখ হয়। বাবার অসুখ খুবই মজার ব্যাপার। অসুখ হলে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের চারপাশে বসিয়ে উঁচুগলায় কবিতা আবৃত্তি করতেন। এতে নাকি তাঁর অসুখের আরাম হত।

এই অসুখের সময়ই তিনি একবার ঘোষণা করলেন, সঞ্চয়িতা থেকে যে একটা কবিতা মুখস্থ করে তাঁকে শোনাতে পারবে সে এক আনা পয়সা পাবে। দুটো মুখস্থ করলে দুআনা।

আমি বিপুল উৎসাহে কবিতা মুখস্থ করতে শুরু করলাম। এর মধ্যে কোনো কাব্যপ্রীতি কাজ করেনি। আর্থিক ব্যাপারটাই ছিল একমাত্র প্রেরণা। যথাসময়ে একটা কবিতা মুখস্থ হয়ে গেল। নাম 'এবার ফিরাও মোরে'। দীঘ কবিতা। এই দীর্ঘ কবিতাটা মুখস্থ করার পেছনের কারণ হল, এটা বাবার খুব প্রিয় কবিতা। তাঁদের সময় নাকি বি. এ. ক্লাসে পাঠ্য ছিল।

বাবা আমার কবিতা আবৃত্তি শুনলেন।

কোনো ভুল না করে এই দীর্ঘ কবিতাটি বলতে পারায় তিনি আনন্দে

অভিভূত হলেন। এক আনার বদলে আমি চার আনা পয়সা পেলাম। সাহিত্যবিষয়ক কর্মকাণ্ড থেকে ওটাই ছিল আমার প্রথম রোজগার।

প্রসঙ্গ থেকে আবার সরে এসেছি। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রসঙ্গে ফিরে যাই। বুঝতে পারছি, এরকম সমস্যা বারবার হবে, মূলধারা থেকে সরে আসব উপধারায়। কে জানে সেই উপধারাই হয়তোবা মূলধারা। তা ছাড়া আত্মজীবনীমূলক রচনায় মূল্যহীন অংশগুলিই বেশি মূল্য পায়।

গানবাজনা বাবার বড়ই প্রিয় ছিল। বি. এ. পাশ করার পর কলকাতায় কী-একটা পার্ট-টাইম কাজ জুটিয়ে কিছু পয়সা করেন। তা দিয়ে যে-বস্তুটি কেনেন তার নাম কলের গান। দম দিয়ে চালানো কলের গান। কোডাক ক্যামেরাটা ছাড়া অন্য কোনো জাগতিক বস্তুর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না ; কিন্তু এই যন্ত্রটির প্রতি তাঁর মমতার সীমা ছিল না। পার্ট-টাইম চাকরিটি চলে যাবার পর তিনি অথই জলে পড়েন। কলকাতার যে-মেসে থাকতেন তার ভাড়া বাকি পড়ে। শখের জিনিস এক এক করে বিক্রি করে ফেলার অবস্থায় পৌঁছে যান। বিক্রি করার মতো অবশিষ্ট যা থাকে তা হচ্ছে কলের গান, যা বিক্রি করা আমার বাবার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সেই সময় তাঁর বন্ধুবান্ধবরা বললেন, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সঙ্গে দেখা করলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক তখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষিত মুসলমান ছেলে তাঁর কাছে চাকরির আবেদন করলেই কাজ সমাধা। কিছু-না-কিছু তিনি জুটিয়ে দেবেনই। বাবা বি এ. পাশ করেছেন ডিসটিংশন নিয়ে। খুব শখ ছিল ইংরেজি সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়বেন। অর্থের অভাবে তা হয়ে উঠছে না। সেই সময় মুসলমান ছেলেদের চাকরিবাকরির প্রায় সব দরজাই বন্ধ। বাবা ঠিক করলেন, দেখা করবেন শেরে বাংলার সঙ্গে। এই অভাব আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

অতিব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী বাবাকে সাক্ষাতের সুযোগ দিলেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল ঃ

বি. এ. পাশ করেছ?

জি।

ফলাফল কী?

বি. এ.-তে ডিসটিংশন ছিল।

বাহ্, খুব খুশি হলাম শুনে। এম. এ. পড়বে তো?

জি জনাব, ইচ্ছা আছে।

ইচ্ছে আছে বললে হবে না—পড়তেই হবে। তুমি কি আমার কাছে বিশেষ কোনো কাজে এসেছ? কোনো সাহায্য বা কোনো সুপারিশ, কিংবা চাকরি?

বাবার খুবই লজ্জা লাগল। তিনি বললেন, জি না, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অন্য কোনো কারণে না।

শেরে বাংলা বেশ খানিকক্ষণ বাবার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, সবাই আমার কাছে তদবির নিয়ে আসে। অনেকদিন পর একজনকে পাওয়া গেল যে কোনো তদবির নিয়ে আসেনি। আমি খুব আনন্দিত হলাম। তুমি এম. এ. পাশ করার পর পেশা হিসাবে শিক্ষকতা বেছে নেবে। আমার ধারণা তুমি ভালো শিক্ষক হবে।

বাবা সেই রাতেই কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের কুতুবপুর চলে আসেন। বাড়ি থেকে সাত মাইল দূরে মীরকাশেম নগরের এক স্কুলে বিপুল উৎসাহে শিক্ষকতা শুরু করেন। মাসের শেষে বেতন নিতে গেলে হেডমাস্টার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, আদায়পত্র কিছুই নেই, বেতন দেব কী? দেখা যাক পরের মাসে।

পরের মাসেও একই অবস্থা। তার পরের মাসেও তা-ই। হেডমাস্টার সাহেব মাথা দুলিয়ে বললেন, শিক্ষকতা হচ্ছে মহান পেশা। আত্মনিবেদন থাকতে হয়। শুধু টাকা টাকা করলে কি হয়?

অভাব-অনটনে বাবার জীবন পর্যুদস্ত হয়ে গেল। চাকরির দরখাস্ত করেন—চাকরি পান না। এর মধ্যে বিয়েও করে ফেলেছেন। স্ত্রীকে নিজের কাছে এনে রাখার সামর্থ্য নেই। ঘোর অমানিশা। এই অবস্থায় কী মনে করে জানি ব্রিটিশ সরকারের বেঙ্গল পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টরির পরীক্ষায় বসলেন। সেই সময়ের অত্যন্ত লোভনীয় এই চাকরিতে নির্বাচিত হবার জন্যে কঠিন সব পরীক্ষায় বসতে হত। তিনি পরীক্ষা দিতে বসলেন। গ্রহের ফেরে এই পরীক্ষায় প্রথম হয়ে গেলেন। ট্রেনিং নিতে গেলেন পুলিশ একাডেমী সারদায়।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পুলিশের চাকরিটি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। বাবার মৃত্যুর পর দেখা গেল, এই জীবনে তিনি চার হাজারের মতো বই এবং পোস্টাপিসের পাশবই-এ একশত তিরিশ টাকা ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। বইয়ের সেই বিশাল সংগ্রহও পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নির্দেশে পিরোজপুরের একদল হৃদয়হীন মানুষ লুট করে নিয়ে যায়। বাবাকে ধরে নিয়ে যায় বলেশ্বর নদীর তীরে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। ভরা পূর্ণিমায় ফিনকি-ফোটা জ্যোৎস্নায় তাঁর রক্তাক্ত দেহ ভাসতে থাকে বলেশ্বর নদীতে। হয়তো নদীর শীতল জল তাঁর রক্ত সে-রাতে ধুয়ে দিতে চেষ্টা

করেছে। পূর্ণিমার চাঁদ তার সবটুকু আলো ঢেলে দিয়েছে তাঁর ভাসন্ত শরীরে। মমতাময়ী প্রকৃতি পরম আদরে গ্রহণ করেছে তাঁকে।

এই প্রসঙ্গ থাক। এই প্রসঙ্গে আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। বরং মা'র কথা বলি।

## আমার মা

আমার মা ছিলেন তাঁর পরিবারের প্রথম সন্তান। শ্যামলা ধরনের একহারা গড়নের মেয়ে। অতি আদরের মেয়ে। কেমন করে জানি সবার ধারণা হল, এই মেয়ে তেমন বুদ্ধিমতী হয়নি। তাঁকে বুদ্ধিমতী বানানোর জন্যে ছোট বয়সেই পাঠিয়ে দেওয়া হল বারহাট্টায়। বারহাট্টায় আমার মা'র মামার বাড়ি। মা'র নানিজান অসম্ভব বুদ্ধিমতী। তিনি যদি ট্রেনিং দিয়ে এই মেয়েকে কিছুটা মানুষ করতে পারেন।

তাঁর ট্রেনিং–এ তেমন কাজ হল না। মা'র বুদ্ধি বিশেষ বাড়ল না। তবে ক্লাস টুতে তখন সরকারি পর্যায়ে একটি বৃত্তি পরীক্ষা হত। মা এই পরীক্ষা দিয়ে মাসে দুটাকা হারে বৃত্তি পেয়ে চারদিকে চমক সৃষ্টি করে ফেললেন। একি কাণ্ড! মেয়েমানুষ সরকারি জলপানি কী করে পায়?

মা'র দুর্ভাগ্য বৃত্তির টাকা তিনি পাননি। কারণ তাঁকে উপরের কোনো ক্লাসে ভরতি করানো হল না। মেয়েদের পড়াশোনার দরকার কী! চিঠি লিখতে পারার বিদ্যা থাকলেই যথেষ্ট। না থাকলেও ক্ষতি নেই। মেয়েমানুষের এত চিঠি লেখালেখিরই-বা কী প্রয়োজন? তারা ঘর-সংসার করবে। নামাজ-কালাম পড়বে। এর জন্যে বাংলা-ইংরেজি শেখার দরকার নেই। তারচে বরং হাতের কাজ শিখুক। রান্নাবান্না শিখুক, আচার বানানো শিখুক, পিঠা বানানো শিখুক। বিয়ের সময় কাজে লাগবে।

আমার মা পড়াশোনা বাদ দিয়ে এইসব কাজ অতি যত্নের সঙ্গে শিখতে লাগলেন। তা ছাড়া নানিজান প্রতি বৎসর একটি করে পুত্র বা কন্যা জন্ম দিয়ে ঘর ভরতি করে ফেলছেন। তাঁর সর্বমোট বারোটি সন্তান হয়। বড় মেয়ে হিসেবে ছোট ছোট ভাইবোনদের মানুষ করার কিছু দায়িত্বও মা'র উপর চলে আসে।

এই করতে করতে একদিন তাঁর বয়স হয়ে গেল পনেরো। কী সর্বনাশের কথা! পনেরো হয়ে গেছে এখনও বিয়ে হয়নি! বারহাট্টা থেকে কঠিন সব চিঠি আসতে লাগল যেন অবিলম্বে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করা হয়। চারদিকে সুপাত্র খোঁজা চলতে

লাগল। একজন সুপাত্রের সন্ধান আনলেন মা'র দূর-সম্পর্কের চাচা, শ্যামপুরের দুদু মিয়া। দুদু মিয়াও পাগল ধরনের মানুষ। বি. এ. পাশ করেছেন। দেশ নিয়ে মাথা ঘামান। কী করে অশিক্ষিত মূর্খ মুসলমানদের রাতারাতি শিক্ষিত করা যায়, সেই চিন্তাতেই তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটে। শ্যামপুরের অতি দুর্গম অঞ্চলে তিনি ইতিমধ্যে একটা স্কুল দিয়ে ফেলেছেন। সেই স্কুলে একদল রোগাভোগা ছেলে সারাদিন স্বরে অ, স্বরে আ বলে চ্যাঁচায়। যে-মানুষটি এইসব কর্মকাণ্ডের মূলে তাঁর বিচারবুদ্ধির উপর খুব আস্থা রাখা যায় না। তবু আমার নানাজান তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হয় ঃ

ছেলে কী করে?

কিছু করে না। করার মধ্যে যা করে তা হল ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে সারাদিন বই পড়ে।

তুমি তাকে চেন কী করে?

দীর্ঘদিন তার সঙ্গে কলকাতার এক মেসে ছিলাম। তাকে খুব ভালো করে দেখার সুযোগ হয়েছে।

বাড়ির অবস্থা কী?

বাড়ির অবস্থা শোচনীয়।

ছেলের নামকরা আত্মীয়স্বজন কে আছেন?

কেউ নেই। সবাই হতদরিদ্র। তবে ছেলের বাবা উলা পাশ। বড় মৌলানা—অতি সজ্জন ব্যক্তি।

অতি সজ্জন ব্যক্তি দিয়ে কাজ হবে না। ছেলের মধ্যে তো তেমন কিছু দেখছি না। রাতদিন যে-ছেলে বই পড়ে সে আবার কেমন ছেলে? বই পড়লে তো সংসার চলে না।

দুদু মিয়া খানিকক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, এত ভালো ছেলে আমি আমার জীবনে দেখিনি এইটুকু বলতে পারি।

দেখতে কেমন?

রাজপুত্র!

কী বললে?

রাজপুত্র!

ছেলে দেখতে রাজপুত্রের মতো শুধু এই কারণেই নানাজান ছেলের বাবার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলেন। কথা বলে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

আমার দাদা মৌলানা আজিমুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরবি-ফারসিতে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল।

অতি বিনয়ী মানুষ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি হাত তুলে যে-প্রার্থনা করেন তার থেকে মানুষটির চরিত্র স্পষ্ট হবে বলে আমার ধারণা। তিনি বলেন—

"হে পরম করুণাময়, আমার পুত্রকন্যা এবং তাদের পুত্রকন্যাদের তুমি কখনো অর্থবিত্ত দিও না। তাদের জীবনে যেন অর্থকষ্ট লেগেই থাকে। কারণ টাকাপয়সা মানুষকে ছোট করে। আমি আমার সন্তানসন্ততিদের মধ্যে 'ছোট মানুষ' চাই না। বড় মানুষ চাই।"

আমার দাদার চরিত্র আরও স্পষ্ট করার জন্যে আমি আর-একটি ঘটনার উল্লেখ করি। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। কেমন করে যেন পরীক্ষায় খুব ভালো করে ফেলি। পাঁচটি লেটার নিয়ে বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে যাই। টেলিগ্রামে দাদাকে এই খবর পাঠানো হয়। যে-পিওন দাদাকে টেলিগ্রামটি দেন দাদা তাঁকে বসতে বলেন।

পিওন বসে আছেন। দাদা ভেতরবাড়ি চলে গেছেন। বেশ খানিকক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, শোকরানা নামাজ পড়ার জন্যে খানিক বিলম্ব হয়েছে। আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। ভাই, আমি অতি দরিদ্র একজন মানুষ, এই মুহূর্তে আমার কাছে যা টাকাপয়সা ছিল সবই আমি নিয়ে এসেছি। আপনি এই টাকা গ্রহণ করলে আমি মনে শান্তি পাব। কারণ আজ যে-খবর আপনি আমাকে দিলেন এত ভালো খবর এই জীবনে আমি পাই নাই।

এই বলে দাদা নগদ টাকা এবং ভাংতি পয়সায় প্রায় চল্লিশ টাকা একটা রুমালে বেঁধে বিস্মিত পিওনের হাতে দিলেন। শুধু তা-ই না, বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, আমি খুব খুশি হব আপনি যদি দুপুরে চারটা ডালভাত আমার সঙ্গে খান।

তার কিছুদিন পরেই আমি দাদার একটা চিঠি পাই। তাতে তিনি লিখলেন—
"তোমাকে ছোটবেলায় একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তুমি জবাব দিতে পার নাই। আমার মন খারাপ হইয়াছিল। আমার ধারণা ছিল তোমার বুদ্ধি তেমন নাই। আজ তুমি তা ভুল প্রমাণিত করিয়াছ। আমি জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। এই সময়ে তোমার কারণে মনে প্রবল সুখ পাইলাম। মৃত্যুপথযাত্রী একজন বৃদ্ধকে তুমি সুখী করিয়াছ—আল্লাহ তোমাকে তার প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ্ সবাইকে সবার প্রাপ্য দেন।"

যে-প্রশ্নটির জবাব শৈশবে দিতে পারিনি সেটা বলি। তখন ক্লাস টুতে পড়ি। সিলেটের বাসায় দাদা বেড়াতে এসেছেন। অসহ্য গরম। হাতপাখায় হাওয়া খাচ্ছেন। হঠাৎ আমাকে বললেন, 'এই শোন, পাখার ভেতর তো বাতাস ভরা নেই। তবু পাখা নাড়লেই আমরা বাতাস পাই কীভাবে? বাতাসটা আসে

কোত্থেকে?"

আমি সেই কঠিন প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

দাদা দুঃখিত গলায় বললেন, "আমার ধারণা ছিল—তুই পারবি। তুই তো আমার মনটাই খারাপ করে দিলি।"

প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি—আবার প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

ছেলের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা না বলে শুধুমাত্র ছেলের বাবার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলার পরই নানাজান একজন বেকার ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেবার প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন।

মেয়েকে 'বিবাহিত জীবন কী' তা বোঝানোর জন্য বর্ষীয়ান মহিলারা দূর দূর থেকে নাইওর চলে এলেন। নকশি পিঠা তৈরি হয়ে টিনবন্দি হতে লাগল। সন্ধ্যাবেলায় হাতে গড়া সেমাই তৈরি করতে করতে পাড়ার বৌরা মিহি গলায় বিয়ের গীত গাইতে লাগল।

নানাজান কী মনে করে চলে গেলেন মৈমনসিংহ। ছেলে নাটক-নভেল পড়ে. মেয়েকেও তার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। দুএকটা নাটক-নভেল পড়া থাকলে মেয়ের সুবিধা হবে।

লাইব্রেরিতে গিয়ে বললেন, ভালো একটা নভেল দিন তো। আমার মেয়ের জন্যে— বুঝেশুনে দেবেন।

লাইব্রেরিয়ান গম্ভীর মুখে বললেন, মেয়েছেলেকে নাটক-নভেল বই দেওয়া ঠিক না, একটা ধর্মের বই নিয়ে যান—তাপসী রাবেয়া।

জি না, একটা নভেলই দেন।

দোকানদার একটা বই কাগজে মুড়ে দিয়ে দিল। নানাজান মা'র হাতে সেই বই তুলে দিলেন। মা'র জীবনে এটাই প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসের নাম—'নৌকাডুবি'। লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম উপন্যাস পড়েই মা মোহিত। একবার, দুবার, তিনবার পড়া হল, তবু যেন ভালোলাগা শেষ হয় না।

বাসররাতে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কখনো বইটই পড়েছ? এই ধরো, গল্প-উপন্যাস।

মা লাজুক ভঙ্গিতে হ্যাঁসূচক মাথা নাড়লেন।

দুই-একটা বইয়ের নাম বলতে পারবে?

মা ক্ষীণ স্বরে বললেন, নৌকাডুবি।

গভীর বিস্ময়ে বাবা দীর্ঘ সময় কোনো কথা বলতে পারলেন না। এই অজ পাড়াগাঁয়ের একটি মেয়ে কিনা রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' পড়ে ফেলেছে!

সেই রাতে বাবা-মা'র মধ্যে আর কী কথা হয়েছে আমি জানি না। জানার কথাও নয়। তাঁরা আমাকে বলেননি। কিন্তু আমি কল্পনা করে নিতে পারি, কারণ আমি এবং আমার অন্য পাঁচ ভাইবোন তো তাঁদের সঙ্গেই ছিলাম। লুকিয়ে ছিলাম তাঁদের ভালোবাসায়।

গ্রামের যে-বোকা ধরনের মেয়ে বিয়ের পর শহরে চলে এল, আমার ধারণা সে অসম্ভব বুদ্ধিমতী মেয়েদেরই একজন। আমি এখনও তাঁর বুদ্ধির ঝলকে চমকে চমকে উঠি। মা শুধু যে বুদ্ধিমতী তা-ই না, অসম্ভব সাহসী এবং স্বাধীন ধরনের মহিলা।

১৬ই ডিসেম্বরের পর মা আমাদের ভাইবোন সবাইকে নিয়ে ঢাকায় চলে এলেন। হাতে একটি পয়সাও নেই। এই অবস্থায় পুরানা পল্টনে বাড়ি ভাড়া করলেন। আমাদের সবাইকে একত্র করে বললেন, তোরা তোদের পড়াশোনা চালিয়ে যা। সংসার নিয়ে কাউকে ভাবতে হবে না। আমি দেখব।

পুরানা পল্টনের ঐ বাড়িতে আমাদের কোনো আসবাবপত্র ছিল না। আমরা মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে ঘুমুতাম। কেউ বেড়াতে এলে তাকে মেঝেতেই বসতে হত।

মা নানান সমিতিতে ঘুরে ঘুরে সেলাইয়ের কাজ জোগাড় করলেন। দিনরাত মেশিন চালান। জামাকাপড় তৈরি করেন। সেলাইয়ের রোজগারের সঙ্গে বাবার পেনশনের নগণ্য টাকা যুক্ত হয়ে সংসার চলত। তিনি শুধু যে ঢাকার সংসার চালাতেন তা-ই না, মোহনগঞ্জে তাঁর বাবার বাড়ির সংসারও এখান থেকেই দেখাশোনা করতেন। অনেক কাল আগে গ্রামের এই বোকা-বোকা ধরনের লাজুক কিশোরী মেয়েটি কখনো কল্পনাও করতে পারেনি কী কঠিন সংগ্রামময় জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্যে। যুদ্ধক্লান্ত এই বৃদ্ধা এখন কী ভাবেন আমি জানি না। তাঁর পুত্রকন্যারা নানানভাবে তাঁকে খুশি করতে চেষ্টা করে। তিনি তাদের সে সুযোগ দিতে চান না। আমার ছোট ভাই ডঃ জাফর ইকবাল আমেরিকা থেকে টিকিট পাঠিয়ে দিয়ে লিখল—মা, আপনি আসুন, আপনাকে আমেরিকা এবং ইউরোপ ঘুরিয়ে দেখাব। আপনার ভালো লাগবে।

মা বললেন, যে-জিনিস তোমার বাবা দেখে যেতে পারেননি, আমি তা দেখব না।

আমি বললাম, আম্মা, আপনি কি হজে যেতে চান? যেতে চাইলে বলুন, ব্যবস্থা করি।

না।

ছোটবেলায় দেখেছি আপনি জরি দিয়ে তাজমহলের ছবি এঁকেছিলেন। তাজমহল দেখতে ইচ্ছা করে?

না। আমি একা একা কিছু দেখব না।

বাবা যেসব জিনিস খেতে পছন্দ করতেন তাঁর মৃত্যুর পর কোনোদিন সেই খাবার বাসায় রান্না করেননি। সেইসব খাবারের একটি হচ্ছে বুটের ডাল দিয়ে গোরুর গোশত। আর একটি—বরবটির চচ্চড়ি। আহামরি কোনো খাবার নয়।

আমি একবার বললাম, আমাদের জন্যে আপনার কি কোনো উপদেশ আছে?

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, উপদেশ নয়, একটি আদেশ আছে। আদেশটি হচ্ছে—কেউ যদি কখনো তোমাদের কাছে টাকা ধার চায় তোমরা 'না' বলবে না। আমাকে অসংখ্যবার মানুষের কাছে ধারের জন্যে হাত পাততে হয়েছে। ধার চাওয়ার লজ্জা এবং অপমান আমি জানি।

(অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলি) মা'র অসাধারণ-ইএসপি বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ছিল। প্রায় সময়ই ভবিষ্যতে কী ঘটনা ঘটবে তা হুবহু বলে দিতে পারতেন। মা'র এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পর্কে বাবা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। মা'কে তিনি ঠাট্টা করে ডাকতেন 'মহিলা পীর'। মা'র এই ক্ষমতা বাবার মৃত্যুর পরপরই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়।*

## জোছনার ফুল

আমাদের বাসা ছিল সিলেটের মীরাবাজারে।

সাদা রঙের একতলা দালান। চারদিকে সুপারিগাছের সারি। ভেতরের উঠোনে একটি কুয়া। কুয়ার চারপাশ বাঁধানো। বাড়ির ডানদিকে প্রাচীন কয়েকটা কাঁঠালগাছ। কাঁঠালগাছের পাতায় আলো-আঁধারের খেলা। কুয়ার ভেতর উঁকি মারছে নীল আকাশ। একটু দূরে দুটো আতাফল গাছ। সোনালি রঙের আতাফলে পুরো গাছ সোনালি হয়ে আছে। পাকা আতার লোভে ভিড় করেছে রাজ্যের পাখি। তাদের সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেছে কাকদের। কান পাতা দায়। এমন একটা রহস্যময় পরিবেশে আমার শৈশবের শুরু। শুরুটা খুব খারাপ না। তবু শৈশবের কথা মনে হলেই প্রথমে কিছু দুঃখময় স্মৃতি ভিড় করে। কিছুতেই তাদের তাড়াতে পারি না। সেগুলো দিয়েই শুরু করি।

---

* 'আমার ছেলেবেলা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর কী মনে করে জানি মা আমেরিকা যেতে রাজি হলেন। ছ'মাস সেখানে কাটিয়ে এসেছেন। কিছুদিন আগে আমাকে বললেন হজ করতে চান।

একদিন কী যেন একটা অপরাধ করেছি। কাপ ভেঙে ফেলেছি কিংবা পাশের বাড়ির জানালায় ঢিল মেরেছি। অপরাধের শাস্তি দেয়া হবে। মা শাস্তির ভার দিলেন আমার মেজো চাচাকে। তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। সিলেটে এম. সি. কলেজে আই. এ. পড়তেন এবং প্রতি বছর ফেল করতেন। মেজো চাচা আমাকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। আমাকে একহাতে শূন্যে ঝুলিয়ে কুয়ার মুখে ধরে বললেন, দিলাম ছেড়ে।

আমার সমস্ত শরীর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। সত্যি যদি ছেড়ে দেন! নিচে গহিন কুয়া। একটা হাত ধরে আমাকে কুয়ার ভেতর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। মেজো চাচা মাঝে মাঝে এমন ভঙ্গি করছেন যেন আমাকে সত্যি সত্যি ছেড়ে দিচ্ছেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আর কোনোদিন করব না। আর কোনোদিন না।

আমার বয়স তখন কত? পাঁচ কিংবা ছয়। নিতান্তই শিশু। এরকম একটা শিশুকে কুয়ায় ঝুলিয়ে যে-ভয়ংকর মানসিক শাস্তি মেজো চাচা দিলেন তা ভাবলে আমি আজও আতঙ্কে নীল হয়ে যাই। লিখতে লিখতে চোখের সামনে সেই অতলস্পর্শী কুয়া ভেসে উঠছে। বুক ধড়ফড় করা শুরু হয়েছে।

আমার মেজো চাচা কিংবা আমার মা দুজনের কেউই বুঝলেন না একটি শিশুকে এইভাবে মানসিক শাস্তি দেয়া যায় না। এটা অমানবিক। এ-ধরনের শাস্তিতে শিশুর মনোজগতে বড় রকমের বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। বরং তাঁরা দুজনই দেখলেন— আমি একটিমাত্র জিনিসকেই ভয় পাই, সেটা কুয়ায় ঝুলিয়ে ধরা। কাজেই বারবার আমাকে এই শাস্তি দেয়া হতে লাগল।

অসম্ভব দুষ্ট ছিলাম। নানানভাবে সবাইকে জ্বালাতন করতাম। শাস্তি আমার প্রাপ্য ছিল, কিন্তু এত কঠিন শাস্তি না, যে-শাস্তি চিরকালের মতো আমার মনে ছাপ ফেলে যাবে।

আমাকে এই অমানবিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করে আমার ছোট বোন শেফু। তাকেও একদিন এই শাস্তি দেয়া হল। মেজো চাচা তাকে কুয়ার ভেতর ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, দিলাম ছেড়ে।

সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, দেন ছেড়ে।

চাচা বললেন, সত্যি সত্যি ছেড়ে দেব?

সে থমথমে গলায় বলল, ছাড়েন। আপনাকে ছাড়তে হবে।

শেফুর কথাবার্তায় আমার চাচা এবং মা দুজনই খুব মজা পেলেন। বাবা অফিস থেকে ফেরামাত্র তাঁকে এই ঘটনা বলা হল। বাবা অবাক হয়ে বললেন, এদের এইভাবে শাস্তি দেয়া হয়? কই, আমি তো জানি না! কী ভয়ংকর কথা! এই

জাতীয় শাস্তির কথা আর যেন কোনোদিন না শুনি।

মা বললেন, এরা বড় যন্ত্রণা করে। তুমি তো বাসায় থাক না। তুমি জান না।

বাবা কঠিন গলায় বললেন, এ-ধরনের শাস্তির কথা আর যেন না শুনি।

শাস্তি বন্ধ হল, কিন্তু মন থেকে স্মৃতি মুছল না। কতদিন পার হয়েছে, অথচ এখনও দুঃস্বপ্নের মতো গহিন কুয়াটার কথা মনে পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, আমার এই চাচা শুধু শাস্তিদাতাই ছিলেন না, প্রচুর আদরও তাঁর কাছে পেয়েছি। আমার অক্ষরজ্ঞানও হয়েছে তাঁর কাছে।

কুয়ার হাত থেকে বাঁচলেও মাকড়সার হাত থেকে বাঁচলাম না। মাকড়সার ব্যাপারটি বলি। কোনো–এক বিচিত্র এবং জটিল কারণে আমাদের ছ' ভাইবোনেরই ভয়ংকর মাকড়সাভীতি আছে। নিরীহ ধরনের এই পোকাটিকে দেখামাত্রই আমাদের সবার মনোজগতে একধরনের বিপ্লব ঘটে যায়। আমরা আতঙ্কে ঘৃণায় শিউরে উঠি, বমিভাব হয়, চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। মনোবিজ্ঞানীরা এই ভীতির নিশ্চয়ই একটা ব্যাখ্যা দেবেন। আমার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই।

মাকড়সাভীতির মাত্রা বোঝানোর জন্যে আমি আমাদের তিন ভাইবোনের তিনটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

আমার ছোট বোন শেফু কলেজে অধ্যাপনা করে। একদিন রিকশা করে ক্লাসে যাচ্ছে, হঠাৎ রিকশা থেকে একটা মাকড়সা তার শাড়িতে উঠে পড়ল। সে লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে অসংখ্য মানুষের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শাড়ি খুলে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, মাকড়সা! আমার শাড়িতে মাকড়সা! লোকজন হৃদয়হীন নয়। তারা শাড়ি থেকে মাকড়সা সরিয়ে হাতে শাড়ি তুলে দিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আমার ছোট ভাই ডঃ জাফর ইকবালকে নিয়ে। সে শিকাগো বাস-স্টেশনের টয়লেটে গেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করল ইউরিন্যালে সবুজ রঙের একটা বড়সড় মাকড়সা। সে বিকট একটা চিৎকার দিয়ে বের হয়ে এল। লোকজন দৌড়ে এল, পুলিশ ছুটে এল, সবার ধারণা কোনো খুনটুন হয়ে গেছে।

এবার আমার নিজের কথা বলি। ঢাকা থেকে বরিশাল যাচ্ছি। বি এম কলেজে রসায়নশাস্ত্রের এম. এস-সি. পরীক্ষার এক্সটারন্যাল হয়ে। প্রথম শ্রেণীর একটি কেবিন রিজার্ভ করা। রাত দশটার মতো বাজে। হঠাৎ দেখি কেবিনের ছাদে বিশাল এক মাকড়সা পেটে ডিম নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। আমি ছিটকে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। দশ টাকা কবুল করে একজন ঝাড়ুদার নিয়ে এলাম। সে অনেক খুঁজেও মাকড়সা পেল না, কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে।

কেবিনে আর ঢুকলাম না। যদি মাকড়সা আবার কোনো অন্ধকার কোণ থেকে বের হয়ে আসে! প্রচণ্ড শীতের রাত পার করে দিলাম ডেকে হাঁটাহাঁটি করে। যতবার মাকড়সার কথা মনে পড়ল ততবারই শিউরে উঠতে লাগলাম।

এই ভীতি আমরা ভাইবোনেরা জন্মসূত্রে নিয়ে এসেছি। হয়তোবা আমাদের জিনের ছয়চল্লিশটির ক্রমোজমের কোনো-একটিতে কোনো গণ্ডগোল আছে যার কারণে এই অস্বাভাবিক ভীতি।

শৈশবে আমাকে ঘুম-পাড়ানোর জন্যে এই মাকড়সাভীতিও কাজে লাগানো হত।

অধিকাংশ শিশুর মতো আমারও রাতে ঘুম আসত না। মা বিরক্ত হয়ে মেজো চাচাকে বলতেন, ওকে ঘুম পাড়িয়ে আন।

মেজো চাচা আমাকে কোলে নিয়ে চলে যেতেন বাড়ির দক্ষিণে কাঁঠালগাছের কাছে। সেই কাঁঠালগাছে বিকটাকার মাকড়সা জাল পেতে চুপচাপ বসে থাকত। আমাকে সেইসব মাকড়সার কাছে নিয়ে গিয়ে বলা হত—ঘুমাও। না ঘুমালে মাকড়সা গায়ে দিয়ে দেব। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তাম। এখন আমার ধারণা, ঘুম না, ভয়ে হয়তোবা অচেতনের মতো হয়ে যেতাম। কেউ তা বুঝতে পারত না। ভাবত ঘুম-পাড়ানোর চমৎকার অষুধ তাঁদের কাছে আছে।

এখন ভাবলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। না বুঝে বয়স্ক মানুষরা নিতান্তই অবোধ একটি শিশুর উপর কী ভয়াবহ নির্যাতনই-না চালিয়েছেন!

আমি ছেলেবেলার কথা লিখব বলে স্থির করার পর আমার সব আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লিখে জানালাম—আমার ছেলেবেলা সম্পর্কে কেউ যদি কোনোকিছু জানেন আমাকে যেন লিখে জানান। আমার এই আহ্বানের জবাবে ছোট চাচা ময়মনসিংহ থেকে যে-চিঠি লিখলেন তার অংশবিশেষ এইরকম—"হুমায়ূন শৈশবে বড়ই দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। রাত্রিতে কিছুতেই ঘুমাইত না। তখন তাহাকে মাকড়সার কাছে নিয়া গেলে দুই হাতে গলা জড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে অচেতন হইয়া যাইত। ইহার কি যে কারণ কে জানে।"

কুয়া এবং মাকড়সা এ দুটি জিনিস বাদ দিলে আমার শৈশবকে অসাধারণ আনন্দময় সময় বলা যায়। আমার ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। আজকালকার মায়েরা সন্তান চোখের আড়াল হলেই চোখ কপালে তুলে হৈচৈ শুরু করে দেন। আমাদের সময় অবস্থা ভিন্ন ছিল। শিশুদের খোঁজ পড়ত শুধু খাওয়ানোর সময়। তাদের পড়াশোনা নিয়েও বাবা-মা'দের খুব দুশ্চিন্তা ছিল না। একটি শিশুশিক্ষা এবং ধারাপাতের চটি একটা বই এবং স্লেট-পেনসিল কিনে দিলেই বাবা-মা'রা মনে করতেন অনেক করা হল। বাকি পড়াশোনা ধীরেসুস্থে হবে, এমন তাড়া কিসের?

ক্লাস ওয়ান-টু'র পরীক্ষাগুলিতে ফার্স্ট হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। পাশ করে পরের ধাপে উঠতে পারলেই হল। না পারলেও ক্ষতি নেই, পরের বার উঠবে। স্কুল তো পালিয়ে যাচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটায় একধরনের ঢিলেঢালা ভাব।

এমনিতেই নাচুনি বুড়ি তার উপর ঢাকের বাড়ি। বাবা আদেশ জারি করলেন, তাঁর ছেলেমেয়েদের যেন পড়াশোনার ব্যাপারে কোনো চাপ না দেয়া হয়। পড়াশোনার জন্যে সারাজীবন তো পড়েই রইল, শিশুকালটা আনন্দে কাটুক। মহানন্দে সময় কাটতে লাগল। শিশুদের আনন্দের উপকরণ চারদিকে ছড়ানো। অতি তুচ্ছ বিষয় থেকেও তারা আনন্দ আহরণ করে। আমিও তা-ই করছি। আমার মা'র কোলে তখন আমার ভাই ইকবাল। মা তাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। আমার দিকে তাকানোর সময় নেই। আমি মনের আনন্দে একা একা ঘুরি। যা দেখি তা-ই ভালো লাগে। ক্লান্তিহীন হাঁটা। মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে ফেলি। তখন একে-তাকে জিজ্ঞেস করতে হয়, মীরাবাজার কোনদিকে?

আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতেও বাসায় কাউকে কখনো চিন্তিত হতে দেখিনি। দুপুরে খাবার সময় উপস্থিত থাকলেই হল। দুপুরের খাবার শেষ হবার পর আরও আনন্দ। মা দিবানিদ্রায়। ঝিম-ধরা দুপুর। আমি ঘুরছি নিজের মনের আনন্দে। এই পর্যায়ে একজন আইসক্রিমওয়ালার সঙ্গে আমার খাতির হয়ে গেল। তখনকার আইসক্রিমওয়ালারা দুহাতে দুটা আইসক্রিমের বাক্স নিয়ে মধুর গলায় ডাকত—দুধমালাই আইসক্রিম, দুধমালাই।

দুরকম আইসক্রিম ছিল। দুপয়সা দামের সাধারণ আর এক আনা দামের অসাধারণ। আইসক্রিম খাবার পরম সৌভাগ্য মাসে দুএকবারের বেশি হত না। হবার কথাও নয়। যা-ই হোক, এমনি এক ঝিম-ধরা দুপুরে 'চাই দুধমালাই আইসক্রিম' শুনে ছুটে ঘর থেকে বের হলাম। আইসক্রিমওয়ালা বলল, আইসক্রিম কিনবে?

আমি মনের দুঃখ মনে চেপে বললাম, না। পয়সা নাই। আইসক্রিমওয়ালা কিছুক্ষণ কী জানি ভেবে বলল, খাও একটা আইসক্রিম, পয়সা লাগবে না।

আমার তখন বিস্মিত হবার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গেছে। কী বলে এই লোক? না চাইতেই দিয়ে দিচ্ছে কোহিনূর হীরা! লোকটি একটা আইসক্রিম বের করে হাতে দিয়ে বলল, আরাম করে খাও। আমি বসে বসে দেখি।

সে উবু হয়ে বসল। আমি অতি দ্রুত আইসক্রিম শেষ করলাম। কেউ দেখে ফেললে সমস্যা হতে পারে। দেখল না। রোজ এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে লাগল। ঠিক দুপুরবেলা সমস্ত মীরাবাজারের মায়েরা যখন ঘুমে অচেতন তখন

সে আসে। চাপা গলায় ডাকে, এই খোকা, এই!

আমি ছুটে বের হয়ে আসি। সে আইসক্রিম বের করে দেয়। আমি মহানন্দে খাই। খেতে খেতে মনে হয় আমার মানবজন্ম সার্থক হল। পুরো এক মাস ধরে এই ব্যাপার চলল। তারপর মা কী করে জানি টের পেলেন। তিনি আঁতকে উঠলেন, তাঁর ধারণা এ ছেলেধরা। বাসার সবারই ভয়—আমাকে নিয়ে যাবে। বাবাকে খবর দিলেন। তিনিও চিন্তিত হলেন এবং অফিস বাদ দিয়ে এক দুপুরে বাসায় বসে রইলেন—আইসক্রিমওয়ালাকে ধরতে হবে। বেচারা ধরা পড়ল।

বাবা তাঁর পুলিশি গলায় কঠিন ধমক দিলেন। মেঘস্বরে বললেন, তুমি একে রোজ আইসক্রিম খাওয়াও, কারণটা কী?

এমনি খাওয়াই স্যার, কোনো কারণ নাই।

বিনা কারণে কিছুই হয় না—তুমি কারণ বলো।

আইসক্রিমওয়ালা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বাবার হাজারো প্রশ্নের জবাব দিল না। বাবা পুরো মাসে ত্রিশটি আইসক্রিম হিসাব করে তাকে দাম দিয়ে দিলেন এবং বললেন, আর কখনো যেন সে না আসে। সে টাকা নিয়ে চলে গেল, কিন্তু পরদিনই আবার এল। একটা দুধমালাই আইসক্রিম বের করে নিচুগলায় বলল, খোকা তুমি খাও। আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি আইসক্রিম বেচা ছেড়ে দেব।

আমি চিন্তিত স্বরে বললাম, কেন?

সে তার জবাব না দিয়ে কোমল গলায় বলল, খোকা, আমার কথা মনে থাকবে?

আমি বললাম, হুঁ থাকবে।

মানুষকে দেয়া বেশির ভাগ কথাই আমি রাখতে পারিনি। কিন্তু হতদরিদ্র আইসক্রিমওয়ালার কথা আমি মনে রেখেছি। এখনও মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি কীজন্যে সে বিনাপয়সায় আমাকে আইসক্রিম খাওয়াত? আমার বয়েসি কোনো ছেলে কি তার ছিল যে অল্প বয়সে মারা গেছে? দরিদ্র পিতা তার স্নেহ ঢেলে দিয়েছে অচেনা একটি শিশুকে? নাকি অন্য কোনো কারণ আছে?

রহস্যময় এই পৃথিবীতে কিছু-কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। প্রায় তিরিশ বছর পর আইসক্রিম খাওয়ার ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি হল। তখন শ্যামলীতে থাকি। আইসক্রিমওয়ালা এসেছে। আমার বড় মেয়ে নোভা আমার কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে ছুটে গেল আইসক্রিম কিনতে। আইসক্রিম-হাতে হাসিমুখে ফিরে এসে বলল, আইসক্রিমওয়ালা আমার কাছ থেকে টাকা নেয়নি। বিনা টাকায় আইসক্রিম দিল। বলল, টাকা দিতে হবে না।

আমার স্ত্রী চমকে উঠে বলল, নির্ঘাত ছেলেধরা! তুমি এক্ষুনি নিচে যাও।

আমি নিচে গেলাম না। ছেলেবেলার সেই আইসক্রিমওয়ালার কথা ভেবে বড়ই মন কেমন করতে লাগল।

শীতের শুরুতে আমার আনন্দময় আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা যেতে লাগল। শুনলাম আমি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পুরোপুরি বাঁদর হয়ে গেছি। প্যান্ট পরা বলে লেজটা দেখা যায় না। প্যান্ট খুলে ফেললে লেজও দেখা যাবে। আমার বাঁদরজীবনের সমাপ্তি ঘটানোর জন্যই আমাকে নাকি স্কুলে ভরতি করিয়ে দেয়া হবে। আমার প্রথম স্কুলে যাওয়া উপলক্ষে একটা নতুন খাকি প্যান্ট কিনে দেয়া হল। সেই প্যান্টের কোনো জীপার নেই। সারাক্ষণ হাঁ হয়ে থাকে। অবশ্যি তা নিয়ে আমি খুব-একটা উদ্বিগ্ন হলাম না। নতুন প্যান্ট পরছি—এই আনন্দেই আমি আত্মহারা।

মেজো চাচা আমাকে কিশোরীমোহন পাঠশালায় ভরতি করিয়ে দিয়ে এলেন এবং হেডমাস্টার সাহেবকে বললেন চোখে-চোখে রাখতে হবে। বড়ই দুষ্ট।

আমি অতি সুবোধ বালকের মতো ক্লাসে গিয়ে বসলাম। মেঝেতে পাটি পাতা। সেই পাটির উপর বসে পড়াশোনা। ছেলেমেয়ে সবাই পড়ে। মেয়েরা বসে প্রথম দিকে, তাদের পেছনে ছেলেরা। আমি খানিকক্ষণ বিচার-বিবেচনা করে সবচে রূপবতী বালিকার পাশে ঠেলেঠুলে জায়গা করে বসে পড়লাম। রূপবতী বালিকা অত্যন্ত হৃদয়হীন ভঙ্গিতে তুই তুই করে সিলেটি ভাষায় বলল, এই, তোর প্যান্টের ভেতরের সবকিছু দেখা যায়।

ক্লাসের সবক'টা ছেলেমেয়ে একসঙ্গে হেসে উঠল। মেয়েদের আক্রমণ করা অনুচিত বিবেচনা করে সবচে উচ্চস্বরে যে-ছেলেটি হেসেছে, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। হাতের কনুইয়ের প্রবল আঘাতে রক্তারক্তি ঘটে গেল। দেখা গেল ছেলেটির সামনের একটি দাঁত ভেঙে গেছে। হেডমাস্টার সাহেব আমাকে কান ধরে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন। ছাত্রছাত্রীদের উপদেশ দিলেন—এ মহাগুণ্ডা, তোমরা সাবধানে থাকবে। খুব সাবধান। পুলিশের ছেলে গুণ্ডা হওয়াই স্বাভাবিক।

ক্লাস ওয়ান বারোটার মধ্যে ছুটি হয়ে যায়। এই দুই ঘণ্টা আমি কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার সময়টা যে খুব খারাপ কাটল তা নয়। স্কুলের পাশেই আনসার ট্রেনিং ক্যাম্প। তাদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। লেফট রাইট, লেফট রাইট। দেখতে বড়ই ভালো লাগছে। মনেমনে ঠিক করে ফেললাম, বড় হয়ে আনসার হব।

আমার বাবা ফয়জুর রহমান আহমেদ একজন রহস্যময় পুরুষ

আমার মা, কোলে ন'মাস বয়সের ছোট বোন শেফু

মীরকাশেম নগর স্কুলের শিক্ষক আমার বাবা ফয়জুর রহমান আহমেদ

মেয়েদের ফ্রক পরে আমার শৈশবের শুরু আট মাস বয়সে তোলা – প্রথম ছবি

মা'র এক পাশে আমি কোলে জাফর ইকবাল
(কপোট্রনিক সুখ দুঃখ, দীপু নাম্বার টু, হাত কাটা রবিন এবং ক্রুগো-র মতো অসাধারণ কিছু গ্রন্থের জনক)

সাত বছর বয়সে তোলা ছবি। পড়ি ক্লাশ টুতে।

হারানো স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবার পর
ছেলেকে কোলে নিয়ে তোলা মা'র
ছবি

আমার দশ বছর বয়সে তোলা ছবি।
আমরা পাঁচ ভাই বোন এবং
আমাদের পোষা হরিণ 'ইরিনা'

আমি এবং আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী
শেফু

আমার ফুপু মাহমুদা মাত্র তের বছর বয়সে যাঁর জীবনাবসান হয়

সবচেয়ে ছোট ভাই— কার্টুনিস্ট আহসান হাবীব, বর্তমানে উন্মাদ পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক।

সুরসাগর প্রাণেশ দাশ

ক্লাসে দ্বিতীয় দিনেও শাস্তি পেতে হল। মাস্টারসাহেব অকারণেই আমাকে শাস্তি দিলেন। সম্ভবত প্রথম দিনের কারণে আমার উপর রেগে ছিলেন। তিনি মেঘস্বরে বললেন, গাধাটা মেয়েদের সঙ্গে বসে আছে কেন? এই, তুই কান ধরে দাঁড়া।

দ্বিতীয় দিনেও সারাক্ষণ কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, তৃতীয় দিনেও একই শাস্তি। তবে এই শাস্তি আমার প্রাপ্য ছিল। আমি একটা ছেলের স্লেট ভেঙে ফেললাম। ভাঙা স্লেটের টুকরায় তার হাত কেটে গেল। আবার রক্তপাত, আবার কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি।

আমি ভাগ্যকে স্বীকার করে নিলাম। ধরেই নিলাম যে স্কুলের দুঘণ্টা আমাকে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। মাস্টারসাহেবেরও ধারণা হল যে আমাকে কানে ধরে সারাক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে আমি অন্যদের বিরক্ত করার সুযোগ পাব না।

আজকের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি সত্যি আমাকে পাঠশালার প্রথম শ্রেণীটি কান ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাটাতে হয়েছে। তবে আমি একা ছিলাম না, বেশির ভাগ সময় আমার সঙ্গী ছিল শংকর।* সে খানিকটা নির্বোধ প্রকৃতির ছিল। ক্লাসে দুইজন শংকর ছিল। আমি যার কথা বলছি তার নাম মাথামোটা শংকর। মোটা বুদ্ধি অর্থে মাথামোটা নয়, আসলেই শরীরের তুলনায় তার মাথা অস্বাভাবিক বড় ছিল। ক্লাস ওয়ানে সে যতখানি লম্বা ছিল, ক্লাস ফাইভে ওঠার পরও সে ততখানি লম্বাই রইল, শুধু মাথাটা বড় হতে শুরু করল।

ক্লাসে শংকর ছাড়া আমার আর-কোনো বন্ধু জুটল না। সে আমার সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে রইল। আমি যেখানে যাই সে আমার সঙ্গে আছে। মারামারিতে সে আমার মতো দক্ষ নয়, তবে মারামারির সময় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আঁ-আঁ ধরনের গরিলার মতো শব্দ করে প্রতিপক্ষের দিকে ছুটে যেত। এতেই অনেকের পিলে চমকে যেত।

শংকরকে নিয়ে শিশুমহলে আমি বেশ ত্রাসের সঞ্চার করে ফেলি।

এই সময় স্কুলে কিছুদিনের জন্যে কয়েকজন ট্রেনিং-স্যার এলেন। ট্রেনিং-স্যার ব্যাপারটা কী আমরা কিছুই জানি না। হেডস্যার শুধু বলে গেছেন, নতুন স্যাররা আমাদের কিছুদিন পড়াবেন। দেখা গেল নতুন স্যাররা বড়ই ভালো। পড়া না পারলেও শাস্তি দেবার বদলে মিষ্টি করে হাসেন। হৈচৈ করলেও ধমকের বদলে করুণ গলায় চুপ করতে বলেন। আমরা মজা পেয়ে আরও হৈচৈ করি।

---

* এই শংকর বর্তমানে বাংলাদেশের ছবিতে অভিনয় করে বলে শুনেছি।

একজন ট্রেনিং-স্যার কেন জানি না সব ছাত্রছাত্রীকে বাদ দিয়ে আমাকে নিয়ে পড়লেন। অদ্ভুত সব প্রশ্ন করেন। আমার যা মনে আসে বলি আর উনি গম্ভীর মুখে বলেন, তোর এত বুদ্ধি হল কী করে? বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার! তোর ঠিকমতো যত্ন হওয়া দরকার। তোকে নিয়ে কী করা যায় তা-ই ভাবছি। কিছু-একটা করা দরকার।

কিছু করার আগেই স্যারের ট্রেনিংকাল শেষ হয়ে গেল। তিনি চলে গেলেন। তবে কেন জানি কিছুদিন পরপরই আমাকে দেখতে আসেন। গভীর আগ্রহে পড়াশোনা কেমন হচ্ছে তার খোঁজ নেন। সব বিষয়ে সবচে কম নম্বর পেয়ে ক্লাস টু'তে ওঠার সংবাদ পাবার পর স্যারের উৎসাহে ভাটা পড়ে যায়। শুধু যে উৎসাহে ভাটা পড়ে তা-ই না, উনি এতই মন-খারাপ করেন যে আমার নিজেরও খারাপ লাগতে থাকে।

ক্লাস টু'তে উঠে আমি আরেকটি অপকর্ম করি। যে-রূপবতী বালিকা আমার হৃদয় হরণ করেছিল, তাকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলি। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করি বড় হয়ে সে আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছে কি না। প্রকৃতির কোনো-এক অদ্ভুত নিয়মে রূপবতীরা শুধু যে হৃদয়হীন হয় তা-ই না, খানিকটা হিংস্র স্বভাবেরও হয়। সে আমার প্রস্তাবে খুশি হবার বদলে বাঘিনীর মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খামচি দিয়ে হাতের দুতিন জায়গার চামড়া তুলে ফেলে। স্যারের কাছে নালিশ করে। শাস্তি হিসেবে দুই হাতে দুটি ইট নিয়ে আমাকে নীলডাউন হয়ে বসে থাকতে হয়।

প্রেমিকপুরুষদের প্রেমের কারণে কঠিন শাস্তি ভোগ করা নতুন কোনো ব্যাপার নয়, তবে আমার মতো এত কম বয়সে প্রেমের এমন শাস্তির নজির বোধহয় খুব বেশি নেই।

স্কুল আমার ভালো লাগত না। মাস্টাররা অকারণে কঠিন শাস্তি দিতেন। পাঠশালা ছুটির পর বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি যাচ্ছে, এ ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। আমাদের পাঠশালায় প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা। কিন্তু একটা ক্লাস থেকে অন্য ক্লাস আলাদা করা নয়, অর্থাৎ কোথাও কোনো পার্টিশনের ব্যবস্থা নেই। কোনো ক্লাসে একজন শাস্তি পেলে পাঠশালার সবাই তা দেখে বিমলানন্দ ভোগ করত। শিক্ষকরাও যে মমতা নিয়ে পড়াতেন, তাও না। তাঁদের বেশির ভাগ সময় কাটত ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি দেয়ার কলাকৌশল বের করার কাজে। পড়ানোর সময় কোথায়? আমার পরিষ্কার মনে আছে, একজন শিক্ষক ক্লাস ফোর-এর একজন ছাত্রের দিকে একবার প্রচণ্ড জোরে ডাস্টার ছুড়ে মারেন। ছাত্রটির মাথা ফেটে যায়। অজ্ঞান হয়ে-যাওয়া ছাত্রের মাথায় প্রচুর পানি

ঢালাঢালি করে তার জ্ঞান ফেরানো হয়। জ্ঞান ফেরার পর প্রথম যে-প্রশ্নটি তাকে করা হয় তা হচ্ছে, আর এইরকম করবি কোনোদিন?

স্কুলজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলি।

একদিন ক্লাসে গিয়ে দেখি চারদিকে চাপা উত্তেজনা। পড়াশোনা এবং শাস্তি দুটোই বন্ধ। শিক্ষকদের মুখ হাসিহাসি। আমাদের জানানো হল, আমেরিকা নামের এক ধনী দেশ আমাদের দরিদ্র দেশের ছেলেমেয়েদের কিছু সাহায্য দিয়েছে। সেই সাহায্য আমাদের দেয়া হবে।

সাহায্য হিসেবে আমরা সবাই এক টিন গুঁড়া দুধ এবং এক টিন মাখন পেলাম। দুই হাতে দুই টিন নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে গেলাম। মা বিস্মিত হয়ে বললেন, সবাইকে দিয়েছে?

আমি বললাম, হুঁ। স্যার বলেছেন, পাকিস্তানের সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দুই টিন করে দিয়েছে। মা অবাক বিস্ময়ে বললেন, একটা দেশ কত ধনী হলে এমন সাহায্য দিতে পারে! মা আমেরিকার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ হলেন। আমরা সকালের নাশতায় রুটি-মাখন খেতে শুরু করলাম।

টিন দুটি শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় দফায় আবার পাওয়া গেল। এবং জানা গেল প্রতি মাসে দুবার করে দেয়া হবে। স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের ঘর দুধ এবং মাখনের টিনে ভরতি হয়ে গেল। মা'র মুখের হাসি আরও বিস্তৃত হল। আমেরিকা নামের সোনার দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে তিনি সম্ভবত শোকরানা নামাজও আদায় করলেন।

যদিও হেডস্যারের ঘর ভরতি ছিল দুধ এবং মাখনের টিনে, আমরা আর পেলাম না। হেডমাস্টার সাহেব ঠিক করলেন, ছাত্রদের স্কুলেই দুধ বানিয়ে খাওয়ানো হবে। দুধ বানানোর আনুষঙ্গিক খরচ আছে। চুলা কিনতে হবে, ছাত্রদের জন্যে মগ কিনতে হবে, জ্বালানির খরচ আছে। এইসব খরচ মেটানো হবে মাখনের টিন বিক্রি করে।

দুই-তিনদিন তা-ই হল। বিশাল কড়াইয়ে দুধ জ্বাল দেয়া হল। অতি অখাদ্য সেই দুধ জোর করে আমাদের খাওয়ানো হল। শারীরিক শাস্তির চেয়েও সেই শাস্তি ভয়াবহ ছিল। আমরা প্রতিটি ছাত্রছাত্রী মনেপ্রাণে প্রার্থনা করলাম, আল্লাহ, তুমি আমাদের এই দুধের হাত থেকে বাঁচাও।

আল্লাহ শিশুদের প্রার্থনা শুনলেন। শাস্তি বন্ধ হল। দুধ খাওয়ানো শেষ হল। আমাদের শিক্ষকরা সবাই রিকশা ভরতি করে দুধ ও মাখনের টিন বাড়ি নিয়ে গেলেন। আমার বয়স তখন খুবই কম। এই বয়সে দুর্নীতি সম্পর্কে কোনো ধারণা হবার কথা নয়, কিন্তু আমাদের সম্মানিত শিক্ষকরাই সেই ধারণা আমাদের

মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। আমার জীবনে শিক্ষকেরা এসেছেন দুষ্টগ্রহের মতো। আমি সারাজীবনে অনেক কিছু হতে চেয়েছি—আইসক্রিমওয়ালা, জুতা পালিশওয়ালা থেকে ডাক্তার, ব্যারিস্টার—কিন্তু কখনো শিক্ষক হতে চাইনি। চাইনি বলেই বোধহয় এখন জীবন কাটাচ্ছি শিক্ষকতায়।

## মাথামোটা শংকর এবং
## গ্রীন বয়েজ ফুটবল ক্লাব

থ্রী থেকে ফোরে উঠব।

বার্ষিক পরীক্ষা এসে গেছে। বাড়িতে বাড়িতে পড়াশোনার ধুম। আমি নির্বিকার। বই নিয়ে বসতে ভালো লাগে না, যদিও পড়তে বসতে হয়। সেই বসাটা পুরোপুরিই ভান। সবাই দেখল, আমি বই নিয়ে বসে আছি, এই পর্যন্তই। তখন প্রতি সন্ধ্যায় সিলেট শহরে মজাদার ব্যাপার হত—তার নাম 'লেমটন লেচকার'। কথাটা বোধহয় 'লণ্ঠন লেকচার'-এর বিকৃত রূপ। ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে জায়গায় জায়গায় সিনেমা দেখানো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ম্যালেরিয়া এইসব ভালো ভালো জিনিস। আমাদের কাজের ছেলে রফিক খোঁজ নিয়ে আসে আজ কোথায় লেমটন লেচকার হচ্ছে—মুহূর্তে আমরা দুজন হাওয়া। রফিক তখন আমার বন্ধুস্থানীয়। তার কাছ থেকে বিড়ি খাওয়ার উপর কোর্স নিচ্ছি। বিড়ি খেলে কচি পেয়ারা পাতা চিবিয়ে মুখের গন্ধ নষ্ট করতে হয় এসব গুহ্যবিদ্যা শিখে নিচ্ছি। এই জাতীয় শিক্ষায় আমার আগ্রহের কোনো অভাব দেখা যাচ্ছে না।

লেমটন লেকচারের ভূত আমার ঘাড় থেকে নামানোর অনেক চেষ্টা করা হল। নামানো গেল না। মা হাল ছেড়ে দিলেন। এখন আর সন্ধ্যা হলে পড়তে বসতেও বলেন না। আমি মোটামুটি সুখে আছি বলা চলে।

এমন এক সুখের সময়ে মাথামোটা শংকর খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, তার মা তাকে বলেছেন সে যদি ক্লাস থ্রী থেকে পাশ করে ফোর-এ উঠতে পারে তা হলে তাকে ফুটবল কিনে দেবেন।

সে আমার কাছে এসেছে সাহায্যের জন্য, কী করে এক ধাক্কায় পরের ক্লাসে ওঠা যায়। একটা চামড়ার ফুটবলের আমাদের খুবই শখ। সেই ফুটবল এখন মনে হচ্ছে খুব দূরের ব্যাপার নয়। সেইদিনই পরম উৎসাহে শংকরকে পড়াতে বসলাম। যে- করেই হোক তাকে পাশ করাতে হবে। দুজন একই ক্লাসে পড়ি।

এখন সে ছাত্র, আমি শিক্ষক। ওকে পড়ানোর জন্যে নিজেকে প্রথম পড়তে হয়, বুঝতে হয়। যা পড়াই কিছুই শংকরের মাথায় ঢোকে না। মনে হয় তার দুই কানে রিফ্লেক্টর লাগানো। যা বলা হয় সেই রিফ্লেক্টরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, ভেতরে ঢুকতে পারে না। যা-ই হোক, প্রাণপণ পরিশ্রমে ছাত্র তৈরি হল। দুজন পরীক্ষা দিলাম। ফল বের হলে দেখা গেল, আমার ছাত্র ফেল করেছে এবং আমি স্কুলের সমস্ত শিক্ষকদের স্তম্ভিত করে প্রথম হয়ে গেছি। ফুটবল পাওয়া যাবে না এই দুঃখে রিপোর্ট কার্ড হাতে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরলাম।

এই ক্ষুদ্র ঘটনা বাবাকে খুব মুগ্ধ করল। বাসায় যে-ই আসে বলেন, আমার এই ছেলের কাণ্ড শুনুন। পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরেছে। কারণ হল...

এই ঘটনার আরেকটি সুফল হল বাবা মা'কে ডেকে বলে দিলেন—কাজলকে পড়াশোনা নিয়ে কখনো কিছু বলার দরকার নেই। ও ইচ্ছা হলে পড়বে, ইচ্ছা না হলে না। তাকে নিজের মতো থাকতে দাও।

আমি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেলাম।

এই আনন্দের চেয়েও বড় আনন্দ, বিশেষ বিবেচনায় মাথামোটা শংকরকে প্রমোশন দিয়ে দেয়া হল। তার মা সেই খুশিতে তাকে একটা একনম্বরি ফুটবল এবং পাম্পার কিনে দিলেন।

গ্রীন বয়েজ ফুটবল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হল। আমি ক্লাবের প্রধান এবং শংকর আমার অ্যাসিসটেন্ট। আমাদের বাসার কাজের ছেলে রফিক আমাদের ফুলব্যাক। অসাধারণ খেলোয়াড়।

## নানার বাড়ি দাদার বাড়ি

একদিন স্কুল থেকে বাসায় ফিরে দেখি—মা'কে আজ অন্যরকম লাগছে। তাঁর চেহারায় খুকি-খুকি ভাব চলে এসেছে। কথা বলছেন অনেকটা সুরেলা গলায়। ব্যাপারটা কী?

অসাধারণ ব্যাপার একটা ঘটেছে—আমরা নানার বাড়ি এবং দাদার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি। আমার শৈশবের সবচে আনন্দময় সময় হচ্ছে এই দুজায়গায় বেড়াতে যাওয়া। প্রতি দুবছর পরপর একবার তা ঘটত। আমার মনে হত, এত আনন্দ এত উত্তেজনা সহ্য করতে পারব না। অজ্ঞান হয়ে যাব। আমরা ছুটিতে যাচ্ছি। ছুটিতে যাচ্ছি। ছুটিতে যাচ্ছি।

ছুটি!

সিলেট মেলে রাতে চড়ব। গভীর রাতে সেই ট্রেন ভৈরবের ব্রিজে উঠবে আমরা যদি ঘুমিয়ে পড়ি আমাদের ডেকে তোলা হবে। গভীর বিস্ময়ে দেখব ভৈরবের ব্রিজ। ভোরবেলায় ট্রেন পৌঁছবে গৌরীপুর জংশন। ঘুম ভাঙবে চাওয়ালাদের অদ্ভুত গলা চা-গ্রাম চা-গ্রাম শব্দে। মিষ্টি লুচি দিয়ে সকালের নাশতা। চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা গৌরীপুর জংশনে যাত্রাবিরতি। কী আনন্দ! কী আনন্দ! স্টেশনের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ঘুরে বেড়াও। ওভারব্রিজে উঠে তাকিয়ে দ্যাখো পিপীলিকার সারির মতো ট্রেনের সারি। দূরের দিগন্তে বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। সেই ক্ষেতে নেমেছে সাদা বকের দল। তারা উড়ে উড়ে যাচ্ছে, আবার এসে বসছে। আরও অনেক দূরে মেঘের কোলে নীলরঙা গারো পাহাড়। এইগুলি কি এই পৃথিবীর দৃশ্য ? না, এই পৃথিবীর দৃশ্য নয়—ধুলোমাটির এই পৃথিবী এত সুন্দর হতে পারে ?

নানার বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে নিশুতিরাত। কিন্তু স্টেশন গমগম করছে। নানার বাড়ির এবং তাদের আশেপাশের বাড়ির সব পুরুষ চলে এসেছেন। মহিলারাও এসেছেন। তাঁরা স্টেশনে ঢোকেননি, একটু দূরে হিন্দুবাড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন।

দরজা দিয়ে নামার সুযোগ নেই। তার আগেই আমাকে কেউ হাত বাড়িয়ে জানালা দিয়ে কোলে তুলে নিয়েছেন। একজনের কোল থেকে আরেকজনের কোলে ঘুরছি। মা খুশিতে ক্রমাগত কাঁদছেন। আহা কী আনন্দময় দৃশ্য!

দুটি হ্যাজাকবাতিতে রাস্তা আলো করে আমরা রওনা হলাম। দুপাশে অন্ধকার- করা গাছপালায় রাজ্যের জোনাকি জ্বলছে, নিভছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে কালীবাড়ি। মা কালী জিভ বের করে শিবের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, নানার বাড়ি পৌঁছতে তা হলে দেরি নেই। অসংখ্য শিয়াল একসঙ্গে ডাকছে—রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হল বোধহয়।

একবার বলেছি, আবার বলি, আমার জীবনের সবচে আনন্দময় সময় কেটেছে নানার বাড়িতে। বাড়িটার তিনটা ভাগ—মূল বসতবাড়ি, মাঝের ঘর, বাংলাঘর।

বাংলাঘরের সামনে প্রকাণ্ড খাল। বর্ষায় সেই খাল কানায়-কানায় ভরা থাকে। ঘাটে বাঁধা থাকে নৌকা। কাউকে বললেই নৌকা নিয়ে খানিকটা ঘুরিয়ে আনে।

মূল বাড়ির পেছনে ঘন জঙ্গল। এমনই ঘন যে গাছের পাতা ভেদ করে আলো আসে না। সেই জঙ্গলের ভেতর 'সার দেয়াল'। সার দেয়াল হল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নানাদের শক্তিমান পূর্বপুরুষদের কবরস্থান। জঙ্গলে কত বিচিত্র

ফলের গাছ—লটকান, ডেউয়া, কামরাঙা.....।

চারপাশে কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। আমাদের মন-ভুলানোর জন্যে সবার সে কী চেষ্টা! আমার এক মামা (নজরুল মামা) কোত্থেকে ভাড়া করে ধোপাদের এক গাধা নিয়ে এলেন। গাধা যে আসলেই গাধা সেটা বোঝা গেল—সাত চড়ে রা নেই। পিঠে চড়ে বসো, পিঠ থেকে নামো—কিছু বলবে না। শুধু পেছনের দিকে যাওয়া নিষেধ। হঠাৎ লাথি বসাতে পারে।

বাচ্চাদের আনন্দ দেয়ার জন্যে ঘুড়ি উড়ানো হবে। সেই ঘুড়ি নৌকার পালের চেয়েও বড়। একবার আকাশে উঠলে প্লেনের মতো আওয়াজ হতে থাকে। ঘুড়ি বেঁধে রাখতে হয় গাছের সঙ্গে, নয়তো উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে।

সন্ধ্যাবেলা লাটিম খেলা। প্রকাণ্ড এক লাটিম। লাটিম ঘোরানোর জন্যে লোক লাগে দুজন। লাটিম ঘুরতে থাকে ভোঁ-ভোঁ আওয়াজে। আওয়াজে কানে তালা ধরে যায়।

একটু রাত বাড়লে ফাডার টাক্কর (পাঁঠার টক্কর)। দুটি হিংস্র ধরনের বাঁকা শিংয়ের পাঁঠার মধ্যে যুদ্ধ। দুপ্রান্ত থেকে এরা ঘাড় বাঁকিয়ে ছুটে আসবে। প্রচণ্ড শব্দে একজনের শিং-এ অন্যজন আঘাত করবে। আগুনের ফুলকি বের হবে শিং থেকে। শুরু হবে মরণপণ যুদ্ধ, ভয়াবহ দৃশ্য।

মামাদের কেউ গভীর রাতে আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলবেন। তারা 'আউল্লা' দিতে যাচ্ছেন। সঙ্গে যাব কি না। ব্যাপারটা হল আলো দিয়ে মাছ মারা। অল্প পানিতে হ্যাজাকের তীব্র আলো ফেলা হয়। সেই আলোয় দেখা যায় শিং, মাগুর শুয়ে আছে। আলোতে এদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়—নড়তেচড়তে পারে না। তখন থোর দিয়ে তাদের গেঁথে ফেলা হয়।

খুব ভোরে নানাজানের সঙ্গে ভ্রমণ। নানাজানের হাতে দুনলা বন্দুক। তিনি যাচ্ছেন বিলের দিকে, আমরা পেছনে পেছনে আছি। ছররা গুলিতে তিন-চারটা বক একসঙ্গে মারা পড়ল। মৃত পাখিদের ঝুলিয়ে আমরা এগুচ্ছি—নাকে আসছে মাটির গন্ধ, মৃত পাখিদের রক্তের গন্ধ, বারুদের গন্ধ।

সারাদিন পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি, নিশুতিরাতে ঘুম ভেঙে টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শোনা—এই আনন্দের যেমন শুরু নেই তেমনি শেষও নেই। ছোটদের শোবার ব্যবস্থা মাঝের ঘরে। ঢালাও বিছানা। বিছানার একপ্রান্তে মা বসে আছেন, পরিচিতজনরা আসছে। গল্প হচ্ছে, পান খাওয়া হচ্ছে, রাত বাড়ছে। কী চমৎকার সব রাত!

নানার বাড়ি ঘিরে আমার অদ্ভুত সব স্মৃতি। মাঝে মাঝে স্বপ্নদৃশ্যের মতো এরা উঠে আসে। জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারি না। কয়েকটি স্মৃতি উল্লেখ করছি ঃ

ক) সাপে-কাটা রুগিকে ওঝা চিকিৎসা করছে—এই দৃশ্য নানার বাড়িতেই প্রথম দেখি। রুগি জলচৌকিতে বসে আসে, ওঝা মন্ত্র পড়তে পড়তে হাত ঘোরাচ্ছে। সেই ঘুরন্ত হাত অতি দ্রুত নেমে আসছে রুগির গায়ে। চিকিৎসার শেষ পর্যায়ে কাঁইক্যা মাছের কাঁটা দিয়ে রুগির পা থেকে দূষিত রক্ত বের করা হচ্ছে।

খ) মেঘের ডাক শুনে ঝাঁক বেঁধে কইমাছ পানি ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসছে এবং প্রাণপণ চেষ্টা করছে শুকনো দিয়ে কোনো-এক গন্তব্যে যেতে। কেন তারা বর্ষার প্রথম মেঘগর্জনে এমন পাগল হয়, কে বলবে!

গ) ভূতে-পাওয়া রুগির চিকিৎসা করতেও দেখলাম। ভূতের ওঝা এসে রুগির সামনে ঘর কেটে সেই ঘরে সরিষা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। রুগি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বলছে আর মারিস না। আর মারিস না।

ঘ) এক হিন্দুবাড়িতে নপুংসক শিশুর জন্ম হল। কোথেকে খবর পেয়ে একদল হিজড়া উপস্থিত। শুরু হল নাচানাচি। নাচানাচির এক পর্যায়ে এরা গা থেকে সব কাপড় খুলে ফেলল। ঝুড়ি ভরতি করে ডিম নিয়ে এসেছিল, সেইসব ডিম ছুঁড়ে মারতে লাগল বাড়িতে। একসময় শিশুটি তাদেরকে দিয়ে দেয়া হল। মহানন্দে তারা চলে যাচ্ছে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে শিশুটির মা। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় এমন একটি দৃশ্য। আমার নিজের চোখে দেখা।

ঙ) এক সন্ধ্যায় নানার বাড়িতে ঢিল পড়লে লাগল। ছোট ছোট ঢিল নয়—ক্ষেত থেকে উঠিয়ে আনা বিশাল মাটির চাঙড়। নানিজান বললেন, কয়েকটা দুষ্ট জিন আছে। মাঝে মাঝে এরা উপদ্রব করে। তবে ভয়ের কিছু নাই, এইসব ঢিল কখনো গায়ে লাগে না।

ব্যাপারটা পরীক্ষা করবার জন্যে উঠোনে খানিকক্ষণ ছোটাছুটি করলাম। আশেপাশে ঢিল পড়ছে, গায়ে পড়ছে না—বেশ মজার ব্যাপার।

নিশ্চয় এর লৌকিক কোনো ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা থাকলেও আমার জানা নেই। জানতেও চাই না। নানার বাড়ির অনেক রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে এটিও থাকুক। সব রহস্য ভেদ করে ফেলার প্রয়োজনই-বা কী?

এবার দাদার বাড়ি সম্পর্কে বলি।

দাদার বাড়ির এক বিশেষ পরিচিতি ঐ অঞ্চলে ছিল এবং খুব সম্ভব এখনও আছে—'মৌলবিবাড়ি'। এই বাড়ির নিয়মকানুন অন্যসব বাড়ি থেকে শুধু যে আলাদা তা-ই না—ভীষণ রকম আলাদা। মৌলবিবাড়ির মেয়েদের কেউ কোনোদিন দেখেনি, তাদের গলার স্বর পর্যন্ত শোনেনি। এই বাড়িতে গানবাজনা

নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, ভেতরের বাড়িতেও বড় বড় পর্দা। একই বাড়িতে পুরুষদেরও মেয়েদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলতে হত। ভাবের আদানপ্রদান হত ইশারায় কিংবা হাততালিতে। যেমন, পর্দার এপাশ থেকে দাদাজান একবার হাততালি দিলেন, তার মানে তিনি পানি চান। দুবার হাততালি—পান-সুপারি। তিনবার হাততালি—মেয়েদের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে, আরও নিঃশব্দ হতে হবে।

আমাদের হল পিরবংশ। দাদার বাবা জাঙ্গির মুনশি ছিলেন এই অঞ্চলের নামি পিরসাহেব। তাঁকে নিয়ে প্রচলিত অনেক গল্পগাথার একটি গল্প বলি ঃ জাঙ্গির মুনশি তাঁর মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। সেই আমলে যানবাহন ছিল না। দশ মাইল পথ হেঁটে যেতে হল। দুপুরে পৌঁছলেন। মেয়ের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে ফেরার পথে বললেন, মা, আমার পাঞ্জাবির একটা বোতাম খুলে গেছে। তুমি সুই-সুতা দিয়ে একটা বোতাম লাগিয়ে দাও। বোতাম ঘরে আছে তো?

মেয়ে বোতাম লাগিয়ে দিল। তিনি দশ মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে পা দেয়ামাত্র মনে হল, বিরাট ভুল হয়েছে। তাঁর কন্যা যে বোতাম লাগাল সে কি স্বামীর অনুমতি নিয়েছে? স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর সংসারের জিনিস ব্যবহার করা তো ঠিক না। তিনি আবার রওনা হলেন, অনুমতি নিয়ে আসা যাক। আবার কুড়ি মাইল হাঁটা।

অমি নিজে অবিশ্যি এই গল্প অন্যভাবে ব্যাখ্যা করি। আমার ধারণা, মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে এসে তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। আবার মেয়েকে দেখার ইচ্ছা হল। একটা অজুহাত তৈরি করে রওনা হলেন।

দাদার বাড়ির কঠিন সব অনুশাসনের নমুনা হিসেবে একটা গল্প বলি। আমার ফুফুরা খুব সুন্দরী। পির পরিবারের বংশধররা সচরাচর রূপবান হয়। তাঁরাও ব্যতিক্রম নন। দুজন ফুপুই পরীর মতো। বড় ফুপুর বিয়ের বয়স হলে বাবা তাঁর জন্যে একজন ছেলে পছন্দ করলেন। ছেলে বাবার বন্ধু। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.। ছেলেও অত্যন্ত রূপবান। বাবা তাঁর বন্ধুকে সঙ্গে করে গ্রামের বাড়িতে এলেন। দাদাজানের ছেলে পছন্দ হল। মেয়ে দেখানো হল। কারণ ধর্মে নাকি বিধান আছে, বিয়ের আগে ছেলে মেয়েকে এবং মেয়ে ছেলেকে অন্তত একবার দেখতে পারবে। ছেলে মেয়ে দেখে মুগ্ধ। সেই রাতের কথা,—বাবা তাঁর বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছেন। খোলা প্রান্তরে বাবার বন্ধু গান ধরল। রবীন্দ্রনাথের গান তখন শিক্ষিতমহলে গাওয়া শুরু হয়েছে।

গানটি হল—'আজি এ বসন্তে.....'

গান গাওয়ার খবর দাদাজানের কানে পৌছল। তিনি বাবাকে ডেকে নিয়ে বললেন, এই ছেলে যে গান জানে তা তো তুমি বল নাই।

বাবা বললেন, হ্যাঁ, সে গান জানে।

এইখানে মেয়ে বিয়ে দিব না। তুমি জেনেশুনে গান-জানা ছেলে এ-বাড়িতে আনলে কেন?

গান গাওয়া ক্ষতি কী?

লাভ-ক্ষতির ব্যাপার না! আমরা কয়েক পুরুষ ধরে যে-নিয়ম মানছি আমার জীবিত অবস্থায় তার কোনো ব্যতিক্রম হবে না। তুমি যদি রাগ কর আমার কিছুই বলার নাই। রাগ করে বাড়িতে আসা বন্ধ করলেও করতে পার।

দাদাজান তাঁর মেয়েকে নিজে দেখেশুনে পৃথিবী থেকে দূরে সরে থাকা একটি পরিবারে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

আমরা যখন দাদার বাড়িতে বেড়াতে যেতাম, খবর পেয়ে বড় ফুপু আসতেন পালকি করে। পালকি অনেক দূরে অপেক্ষা করত। ফুপুর স্বামী খোঁজ নিতে আসতেন—আমরা যে এসেছি আমাদের সঙ্গে কলের গন আছে কি না। যদি জানতেন কলের গান আছে—সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে যেতেন।

ধীরে ধীরে দাদার বাড়ির মানসিকতার পরিবর্তন হয়। যে-গান এই বাড়িতে নিষিদ্ধ ছিল সেই গানও চালু হয়। দাদার নির্দেশেই হয়। আমার ছোট বোন শেফুর গলায়—"তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে" গান শোনার পর দাদাজান নির্দেশ দেন—গান চলতে পারে।

দাদার বাড়ি প্রসঙ্গে অদ্ভুত একটা কথা বলি। দাদার বাবা জাঙ্গির মুনশির ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিল। দাদাজানেরও ইচ্ছামৃত্যু হয়। মৃত্যুর সাতদিন আগে সবাইকে ডেকে তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় বলেন, কেউ মনে কোনো আফসোস রাখবে না। মন শান্ত করো। আমাকে কেউ যদি বিশেষ কোনো সেবাযত্ন করতে চাও করতে পার।

দাদাজানের বলা সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যু হয় সজ্ঞানে। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে আমার ছোট চাচাকে ডেকে বলেন, আমি তা হলে যাই।

পৃথিবী বড়ই রহস্যময়।

দাদাজানদের বাড়িঘর অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম, গোছানো। মানুষগুলি হৈচৈ করে কম, কাজ করে বেশি। দাদার বাড়িতে আমাদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল না। দাদাজান আমাদের চোখে-চোখে রাখতেন। আদব-কায়দা, ভদ্রতা শেখাতেন। সন্ধ্যাবেলা নামাজ শেষ করেই গল্প করতে বসতেন। সবই ঈশপের

গল্পের মতো। গল্পের শেষে একটা মোরাল থাকত। মোরাল আছে এমন গল্প ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু দাদাজানের গল্প ভালো লাগত। মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।

নানার বাড়ি থেকে দাদার বাড়িতে এলে শুরুতে খানিকটা দমবন্ধ দমবন্ধ লাগত। তবে দাদার বাড়িরও আলাদা মজা ছিল। বাড়ির বাংলাঘরে দুটি কাঠের আলমিরায় ছিল অসংখ্য বই। আসলে এই দুটি আলমিরা নিয়েই একটা পাবলিক লাইব্রেরি। আজিমুদ্দিন আহমেদ পাবলিক লাইব্রেরি। আজিমুদ্দিন আহমেদ আমার দাদার নাম। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর নামে বাবা এই লাইব্রেরি করেন। লাইব্রেরির চাঁদা মাসে এক আনা। এই লাইব্রেরি থেকে কেউ কোনোদিন বই নিয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমরা দাদার বাড়িতে উপস্থিত হলেই শুধু চাবি খুলে বই বের করা হত। চাবি চলে আসত আমার হাতে। দাদার বাড়িতে পুকুরপাড়ে বটগাছের মতো বিশাল এক কামরাঙা গাছ ছিল। সেই কামরাঙা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বই পড়ার আনন্দের কোনো তুলনা হয় না।

বাবা জায়গায়  জায়গায় লোক পাঠিয়ে গ্রাম্য গায়কদের আনতেন। তাঁরা তাঁদের বাদ্যযন্ত্র-হাতে উপস্থিত হতেন—রোগাভোগা, অনাহারক্লিষ্ট মানুষ, কিন্তু তাঁদের চোখ বড়ই স্বপ্নময়।

দাদার বাড়িতে গানবাজনা হবার কোনো উপায় নেই। অনেকটা দূরে বাবার এক বন্ধুর বাড়ির উঠোনে গানের আসর বসত। হাত উঁচু করে যখন গাতক ঢেউ-খেলানো সুরে, মাথার লম্বা বাবড়ি ঝাঁকিয়ে গানে টান দিতেন—

"আমার মনে বড় দুক্ষ
বড় দুক্ষ আমার মনে গো।"

তখন তাঁর মনের 'দুক্ষ' ছড়িয়ে যেত শ্রোতাদের মনে। চোখ ভরে জল আসত। গান চলত গভীর রাত পর্যন্ত। রাত যত গভীর হত গানে ততই আধ্যাত্মিক ভাব প্রাধান্য পেতে থাকত। শেষের দিকে সেগুলি আর গান থাকত না—হয়ে উঠত প্রার্থনা-সংগীত। আমরা ছোটরা অবিশ্যি তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছি। আমাদের কোলে করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু ঘুমের মধ্যে কোনো-এক অদ্ভুত উপায়ে গান শুনতে পাচ্ছি।

## পারুল আপা

স্কুল আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। স্কুলের বাইরের জীবনটা ছিল আনন্দময়। সেই আনন্দের মাঝখানে দুঃস্বপ্নের মতোই উদয় হলেন পারুল আপা। লম্বা বিষাদময় চেহারার একটি মেয়ে। চোখ দুটি অস্বাভাবিক বড়।

থাকেন আমাদের একটি বাসার পরের বাসায়।

তাঁর বাবা ওভারশিয়ার। রোগা একজন মানুষ। মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটেন। চিকন গলায় কথা বলেন। নিজের মেয়েদের অকারণে হিংস্র ভঙ্গিতে মারেন। সেই মার ভয়াবহ মার। যে-কোনো অপরাধে পারুল আপাদের দুবার শাস্তি হয়। প্রথমে বাবার হাতে, পরেরবার মায়ের হাতে। শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে একটা ধারণা দিই। পারুল আপা একবার একটা প্লেট ভেঙে ফেললেন, সেই প্লেট ভাঙার শাস্তি হল, চুলের মুঠি ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা। পারুল আপা পরিবারের সবচেয়ে বড় মেয়ে। তাঁরা অনেকগুলি বোন, কোনো ভাই নেই। নিয়ম করে প্রতি বছর পারুল আপাদের একটি করে বোন হয়। তাঁর বাবা-মা দুজনেরই মুখ অন্ধকার হয়ে যায়।

যে-সময়ের কথা বলছি তখন পারুল আপার বয়স বারো-তেরো, বয়ঃসন্ধিকাল। বাবা-মা'র অত্যাচারে বেচারি জর্জরিত। তাঁর মা তাঁকে ডাকেন হাবা নামে। অথচ তিনি মোটেই হাবা ছিলেন না। তাঁর অসম্ভব বুদ্ধি ছিল। হৃদয় ছিল আবেগ ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। কোনো-এক বিচিত্র কারণে তিনি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ও ভালোবাসা আমার উপর উজাড় করে দিলেন। যে-ভালোবাসা না চাইতেই পাওয়া যায়, তার প্রতি কোনো মোহ থাকে না। পারুল আপার ভালোবাসা আমার অসহ্য বোধ হত। অসহ্য বোধ হবার আরও একটি কারণ ছিল। তাঁর চেহারা তেমন ভালো ছিল না। আমার চরিত্রের বড় রকমের দুর্বল দিকের একটি হচ্ছে, মেয়েদের দৈহিক রূপের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ। যে দেখতে ভালো না, সে হাজারো ভালো হলেও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রূপবতীদের বেলায় আমি অন্ধ। তাদের কোনো ত্রুটি আমার চোখে পড়ে না। তাদের দৈহিক সৌন্দর্যই আমার সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বলতে ইচ্ছে করে, আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

থাক সে কথা, পারুল আপার কথা বলি। তিনি ভালোবাসার কঠিন শিকলে আমাকে বাঁধতে চাইলেন। আমাকে ভুলানোর জন্যে তাঁর সে কী চেষ্টা! বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি করে আমাকে দিতেন। স্কুলের টিফিনের জন্যে তাঁকে সামান্য পয়সা দেয়া হত। তিনি না খেয়ে সেই পয়সা জমিয়ে রাখতেন আমার জন্যে। এর প্রতিদানে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে স্কুলে যেতে হত। সেটা অতি বিরক্তিকর ব্যাপার। তিনি ক্লাস করছেন, আমি বেজার মুখে তাঁর পাশে বসে। তিনি একটা হাতে আমার গলা জড়িয়ে আছেন।

সে-সময় অধিকাংশ মেয়েই ছোট ভাইদের স্কুলে নিয়ে আসত। ছোট ভাইরা অনেক সময় অভিভাবকের মতো কাজ করত। বাবা-মা'রা নিশ্চিন্ত থাকতেন মেয়ের সঙ্গে পুরুষ-প্রতিভূ একজন-কেউ আছে। পারুল আপার সঙ্গে স্কুলে গিয়ে একবার বিরাট সমস্যায় পড়লাম। স্কুল কম্পাউন্ডের ভেতর একজন পাগল ঢুকে গেছে। মেয়েমহলে আতঙ্ক, ছোটাছুটি। আমি পারুল আপার নজর এড়িয়ে পাগল দেখতে গেলাম। কী আশ্চর্য, পাগল আমার চেনা! শুধু চেনা নয়, খুবই চেনা। উনি হচ্ছেন সুরসাগর প্রাণেশ দাস, বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। প্রায়ই বাসায় আসেন। তখন গানের জলসা বসে। আমাদের বাসায় হারমোনিয়াম নেই, আমরা ছুটে গিয়ে লায়লা আপাদের বাসা থেকে হারমোনিয়াম নিয়ে আসি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি গানবাজনা করেন। গায়ক প্রাণেশ দাস, শ্রোতা আমার বাবা। এইসব ওস্তাদি ধরনের গান আমাদের ভালো লাগে না, শুধু বাবা একাই আহা আহা করেন।

প্রাণেশ কাকু পাগল হয়ে গেছেন আমার জানা ছিল না। এখন অবাক হয়ে দেখি তিনি বিচিত্র ভঙ্গি করে মেয়েদের দিকে ছুটে ছুটে যাচ্ছেন। মেয়েরা দিগ্বিদিক- জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে। একে অন্যের উপর গড়িয়ে পড়ছে। আমি অসীম সাহসী। এগিয়ে গেলাম পাগলের দিকে। প্রাণেশ কাকু আমাকে চিনতে পারলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, কী রে বাবু, ভালো ?

আমি বললাম, জি ভালো। আপনি এরকম করছেন কেন ?

প্রাণেশ কাকু লজ্জিত গলায় বললেন, মেয়েগুলিকে ভয় দেখাচ্ছি।

ভয় দেখাচ্ছেন কেন ?

মেয়েগুলি বড় বজ্জাত। তোর বাবা ভালো আছেন ?

জি।

হারমোনিয়াম কিনতে বলেছিলাম, কিনেছে ?

জি না।

শ'খানেক টাকা হলে সিঙ্গেল রীড হারমোনিয়াম পাওয়া যায়। কিনে ফেললে হয়। রোজ-রোজ অন্যের বাসা থেকে আনা—তুই তোর বাবাকে বলবি।

জি আচ্ছা।

আর আমার মাথা যে খারাপ হয়ে গেছে এই খবরটাও দিস। বাড়িতে বেঁধে রাখে। তুই এখানে চুপচাপ দাঁড়া, আমি মেয়েগুলিকে আরেকটু ভয় দেখিয়ে আসি। তারপর তোকে নিয়ে তোদের বাসায় যাব।

জি আচ্ছা।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রাণেশ কাকু আরও কয়েকবার প্রচণ্ড

হুংকার দিয়ে ফিরে এসে আমার হাত ধরে গেটের দিকে রওনা হলেন। সবে তখনই হাতে লম্বা একটা লাঠি নিয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন পারুল আপা। তাঁর মূর্তি প্রাণ- সংহারক। তিনি তীব্র গলায় বললেন, একে ছাড়েন একে না ছাড়লে লাঠি দিয়ে এক বাড়িতে আপনার মাথা ফাটিয়ে দেব। ছাড়ুন বলছি! পাগলের সিক্সথ সেন্স খুব ডেভেলপড্ হয় বলে আমার ধারণা। প্রাণেশ কাকু সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন, আমার হাত না ছাড়লে এই মেয়ে সত্যি সত্যি তার ছোট শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করবে। তিনি আমার হাত ছেড়ে দিলেন। পারুল আপা ছুটে এসে ছোঁ মেরে আমাকে কোলে করে নিয়ে গেলেন। এত প্রবল উত্তেজনা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না—পারুল আপা হাত-পা এলিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

পারুল আপা ছিলেন যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়ে আমার জ্ঞানদাত্রী। পুরুষ এবং রমণীর ভেতর ব্যাহ্যিক সম্পর্ক ছাড়াও যে অন্য একধরনের সম্পর্ক আছে তা প্রথম জানলাম তাঁর কাছে। তখন আমার বয়স আট। ক্লাস থ্রীতে উঠেছি। জটিল সম্পর্কের বিষয় জানার জন্যে বয়সটা খুবই অল্প। খুবই হকচকিয়ে গেলাম—এসব কী বলছে পারুল আপা! কী অদ্ভুত কথা!

পারুল আপার কথা বিশ্বাস করার কোনোই কারণ দেখলাম না। কিন্তু উনিই-বা বানিয়ে বানিয়ে এমন অদ্ভুত কথা বলবেন কেন?

নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা ব্যাখ্যা করার পেছনে পারুল আপার একটা কারণ ছিল। কারণ হচ্ছে, আমাদের পাশের বাসার ভদ্রলোক। ওঁদের বাড়িতে পনেরো-ষোলো বছরের সুন্দরমতো একটি কাজের মেয়ে ছিল। মেয়েটি ভদ্রলোককে বাবা ডাকত। হঠাৎ শুনি, তিনি এই মেয়েটিকে বিয়ে করেছেন। ভদ্রলোকের দুটি বড় মেয়ে কলেজে পড়ে। তারা খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। ভদ্রলোকের স্ত্রী ঘনঘন ফিট হতে লাগলেন। ঘটনাটা চারপাশে বড় ধরনের আলোড়ন তৈরি করল। বড়রা সবাই এই ঘটনা নিয়ে আলাপ করে। সেই আলাপে আমি উপস্থিত হলে চোখ বড় বড় করে বলে—"এই ভাগ!"

কাজেই আমি নিজেই পারুল আপার কাছে জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কী। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, বিয়ে না করে উপায় কী—ঐ মেয়ের পেটে বাচ্চা।

পেটে বাচ্চা হলে বিয়ে করতে হয় কেন?

তোকে বলা যাবে না। খুব লজ্জার কথা।

না, আমাকে বলতে হবে।

কাউকে বলবি না তো?

না, বলব না।

কসম খা।

কিসের কসম?

বল, বিদ্যা।

বিদ্যা।

বল, কোরান।

কোরান।

বল, টিকটিকি।

টিকটিকি বলব কেন? টিকটিকি আবার কীরকম কসম?

টিকটিকির যেমন লেজ খসে যায়—তুইও যদি এই কথা কাউকে বলিস তা হলে তোর জিভও খুলে পড়ে যাবে।

আমি ভয়ে ভয়ে টিকটিকির নামেও কসম করলাম—আর পারুল আপা গন্ধম ফলের সেই বিশেষ জ্ঞান আমাকে দিয়ে দিলেন। আমার মনে আছে, মনে খুব বড় ধরনের আঘাত পেলাম। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হল, না, এসব মিথ্যা। এসব হতেই পারে না। ব্যাপারটা নিয়ে আমি যে কারও সঙ্গে আলাপ করব সেই উপায় নেই। টিকটিকির কসম খেয়েছি। জিহ্বা খুলে পড়ে যেতে পারে।

এই সময় পাশের বাড়ির ঐ ভদ্রলোকের বড় মেয়েটির হাসিরোগ হল। সারাক্ষণ হাসে। খিলখিল করে হাসে। গভীর রাতেও ঘুম ভেঙে শুনি পাশের বাড়ি থেকে হাসির শব্দ আসছে। গভীর রাতে সেই হাসি শুনে বড় ভয় লাগত। গা শিরশির করত। মেয়েটির কোথায় যেন বিয়ে ঠিক হয়েছিল—বাবার এই কাণ্ডে তার বিয়ে ভেঙে যাবার পরই হাসিরোগ হয়। তার কয়েকদিন পরই তারা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ভদ্রলোকের স্ত্রীকে আমি নানু ডাকতাম। মেয়ে দুটিকে খালা। তারা আমাকে খুবই স্নেহ করত। প্রায়ই ডেকে নিয়ে বড়দের মতো কাপে করে চা খেতে দিত। দুনম্বর বোনটি আমাকে সবসময় জিজ্ঞেস করত—তার মতো সুন্দরী কোনো মেয়ে আমি দেখেছি কি না। এর উত্তরে আমি তৎক্ষণাৎ বলতাম, 'না'।

সত্যিই তো?

হ্যাঁ সত্যি।

আমি বেশি সুন্দর, না আপা?

আপনি।

সত্যি-বিদ্যা-কোরান বল।

সত্যি-বিদ্যা-কোরান।

তাঁরা চলে যাবার পর পাশের বাড়ি অনেক দিন খালি পড়ে রইল। আমার

বেশ কিছুদিন খুব মন-খারাপ গেল। অল্প বয়সের মন-খারাপ ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমার বেলায়ও হল না। তা ছাড়া মন-খারাপ ভাব কাটানোর মতো একটা রহস্যময় ঘটনাও ঘটল। একদিন খুব ভোরে দুজন বিচিত্রদর্শন লোক কোদাল নিয়ে পারুল আপাদের ঘরে ঢুকল। তারা নাকি কবর খোঁড়ার লোক। ভেতরের দিকের উঠানে তারা কবর খুঁড়তে শুরু করল। এই ঘটনা শুধু যে শিশুদের মনেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল তা নয়, বড়রাও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। আমার মা'র ধারণা হল ভদ্রলোক তাঁর কোনো-এক মেয়েকে মেরে ফেলেছেন। এখন গোপনে কবর দিয়ে দেয়া হচ্ছে। বাবা মা'কে ধমক দিলেন—এইসব অদ্ভুত ধারণা তুমি পাও কোথায়? নিশ্চয়ই অন্য কোনো ব্যাপার।

আসলেই অন্য ব্যাপার, তবে কম রোমাঞ্চকর না। ওভারশিয়ার কাকুর পকেট থেকে একশো টাকা চুরি করেছে তাঁর পিওন। অথচ সে তা স্বীকার করছে না। কবর খোঁড়া হচ্ছে সেই কারণেই। পিওন একটা কোরান শরিফ হাতে নিয়ে কবরে নামবে এবং কোরান শরিফ হাতে নিয়ে বলবে—সে টাকা নেয়নি। যদি সে মিথ্যা কথা বলে তা হলে আর কবর থেকে উঠতে পারবে না। কবর তাকে আটকে ফেলবে।

সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার জন্য আমরা দল বেঁধে কবরের চারপাশে দাঁড়ালাম। দরিদ্র পিওন হাতে কোরান শরিফ নিয়ে কবরে নামল। সে থরথর করে কাঁপছে। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। তাকে দেখাচ্ছে পাগলের মতো। ওভারশিয়ার কাকু বললেন—এই, তুই টাকা চুরি করেছিস?

জে না।

সত্যি কথা বল। মিথা বললে কবরে আটকে যাবি।

টাকা চুরি করি নাই স্যার।

তোর হাতে কোরান শরিফ, তুই কবরে দাঁড়িয়ে আছিস—মিথ্যা বললে আর উঠতে পারবি না।

তখন এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হল। পিওনের হাত থেকে কোরান শরিফ পড়ে গেল। সে জ্ঞান হারিয়ে কবরের ভেতর পড়ে গেল।

ওভারশিয়ার কাকু বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললেন, বলছিলাম না, টাকা এই হারামজাদাই নিয়েছে!

কবর বন্ধ করা হল, কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ করা হল না। বিশাল একটা গর্তের মতো হয়ে রইল, যে-গর্তের দিকে তাকালেই ভয় ভয় লাগত। এ ছাড়াও আরও সব ভয়াবহ খবর কানে আসতে লাগল—যেমন, গভীর রাতে নাকি এই কবরের

ভেতর থেকে ভারী গলায় কে ডাকে—আয় আয়। একবার কবর পৌড়া হয়ে গেলে কাউকে-না-কাউকে সেখানে যেতে হয়। কবর তার উদর পূর্ণ করবার জন্য মানুষকে ডাকে।

আমি পারুল আপাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিলাম। কী দরকার ঐ ভুতুড়ে বাড়িতে যাবার ? পারুল আপার সঙ্গে যোগাযোগও কমে গেল, কারণ তাঁর স্কুলের খাতায় একটি প্রেমপত্র পাওয়া গেছে। সম্বোধনহীন সেই প্রেমপত্রে তিনি একজনকে অনুরোধ করেছেন তাঁকে চুমু খাবার জন্যে। কেন জানি আমার মনে হয়, ঐ প্রেমপত্রটি তিনি আমাকেই লিখেছিলেন। কারণ আমি ছাড়া অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না। এবং একবার তাঁকে চুমু খাবার জন্যে লাজুক গলায় আমাকে অনুরোধও করেছিলেন। আমি এই অদ্ভুত প্রস্তাবে হেসে ওঠায় খুব লজ্জাও পেয়েছিলেন। তাঁর স্কুলে যাওয়া বন্ধ। জানালার শিক ধরে মাঝে মাঝে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আমাকে দেখলেই তিনি চিকন গলায় ডাকেন। আমি পালিয়ে যাই। তাঁর বাবা-মা তাঁকে বন্দি করে রাখায় আমি একধরনের স্বস্তি বোধ করি। এখন আমাকে বিরক্ত করার সুযোগ তাঁর নেই। পারুল আপার বন্দিজীবন আমাকে বেশিদিন দেখতে হয়নি। তাঁরা মীরাবাজারের বাসা বদলে কোথায় যেন চলে গেলেন। হারিয়ে গেলেন পুরোপুরি।

মানুষ দ্বিতীয়বার শৈশবে ফিরে যেতে পারে না। পারা গেলে আমি অবশ্যই এই অসহায় অভিমানী, দুখি কিশোরীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম। আজ তিনি কোথায় আছেন, কীভাবে আছেন, আমি জানি না। শুধু প্রার্থনা করি—যেখানেই থাকুন যেন সুখ তাঁকে ঘিরে থাকে। পৃথিবী ও মানুষের কাছে সুখ তাঁর প্রাপ্য।

## স্বপ্নলোকের চাবি

পারুল আপা নেই, কাজেই স্কুলের দুঃসহ দুঘণ্টা কোনোক্রমে পার করে দেবার পরের সময়টা মহানন্দের। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা।' সাজানো-গোছানো সুন্দর বাড়ি দেখলেই হুট করে ঢুকে পড়ি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তৎক্ষণাৎ বের করে দেয়া হয়। এর মধ্যে একটি বাড়িতে ভিন্ন ব্যাপার হল। এই বাড়িটিও মীরাবাজারেই। আমাদের বাসার কাছে। বিশাল কম্পাউন্ড, গাছগাছালিতে ছাওয়া ধবধবে সাদা রঙের বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি।

এই বাড়িতে কে থাকেন তাও আমরা জানি, সিলেট এম. সি. কলেজের অধ্যাপক। আমাদের কাছে তাঁর পরিচয় হচ্ছে প্রফেসর সাব, অতি অতি অতি জ্ঞানী লোক—যাঁকে দূর থেকে দেখলেই পুণ্য হয়। তবে এই প্রফেসার সাহেব নাকি পাকিস্তানে থাকবেন না, দেশ ছেড়ে কলকাতা চলে যাবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নাকি চাকরিও হয়েছে। তিনি চেষ্টা করছেন বাড়ি বিক্রির।

এক দুপুরে গেট খোলা পেয়ে হুট করে সেই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লাম। গাছপালার কী শান্ত-শান্ত ভাব। মনে হয় ভুল করে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এক বাড়ির বাগানে ঢুকে পড়েছি। আনন্দে মন ভরে গেল। একা একা অনেকক্ষণ হাঁটলাম। হঠাৎ দেখি কোনার দিকের একটি গাছের নিচে পাটি পেতে একটি মেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার হাতে একটা বই। সে বই পড়ছে না—তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি আমার জীবনে এত সুন্দর মেয়ে আর দেখিনি। মনে হল তার শরীর সাদা মোমের তৈরি। পিঠভরতি ঘন কালো চুল। ষোলো-সতেরো বছর বয়স। দৈত্যের হাতে বন্দিনী রাজকন্যারাও এত সুন্দর হয় না। মেয়েটি হাত-ইশারায় ডাকল। প্রথমে ভাবলাম দৌড়ে পালিয়ে যাই। পরমুহূর্তেই সেই ভাবনা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে গেলাম।

কী নাম তোমার খোকা?

কাজল।

কী সুন্দর নাম! কাজল। তোমাকে মাখতে হয় চোখে। তা-ই না?

কিছু না-বুঝেই আমি মাথা নাড়লাম।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি, তুমি একা একা হাঁটছ। কী ব্যাপার?

আমি চুপ করে রইলাম।

কীজন্যে এসেছ এ-বাড়িতে?

বেড়াতে।

ও আচ্ছা—বেড়াতে? তুমি তা হলে অতিথি। অতিথি নারায়ণ। তা-ই না?

আবারও না-বুঝে আমি মাথা নাড়লাম। সে বলল, তুমি এখানে চুপচাপ দাঁড়াও। নড়বে না। আমি আসছি।

মেয়েটি চলে গেল। ভেবে পেলাম না সে অনধিকার প্রবেশের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করতে গেল কি না। দাঁড়িয়ে থাকাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে? পালিয়ে যাওয়াই উচিত। অথচ পালাতে পারছি না।

মেয়েটি ফিরে এসে বলল, চোখ বন্ধ করে হাত পাতো।

আমি তা-ই করলাম। কী যেন দেয়া হল আমার হাতে। তাকিয়ে দেখি কদমফুলের মতো দেখতে একটা মিষ্টি।

খাও, মিষ্টি খাও। মিষ্টি খেয়ে চলে যাও। আমি এখন পড়াশোনা করছি। পড়াশোনার সময় কেউ হাঁটাহাঁটি করলে বড় বিরক্তি লাগে। মন বসাতে পারি না। আমি চলে এলাম এবং দ্বিতীয় দিনে আবার উপস্থিত হলাম।

আবার মেয়েটি মিষ্টি এনে দিল। কোনো সৌভাগ্যই একা একা ভোগ করা যায় না। আমি তৃতীয় দিনে আমার ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত। মেয়েটি বিস্মিত হয়ে বলল, এ কে?

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, এ আমার ছোট বোন। এ-ও মিষ্টি খুব পছন্দ করে।

মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। সে হাসতে হাসতে বলল, খুকি, তোমার নাম কী?

আমার বোন উদ্বিগ্ন চোখে আমার দিকে তাকাল। নাম বলাটা ঠিক হবে কি না সে বুঝতে পারছে না। আমি ইশারায় তাকে অভয় দিতেই সে বলল, আমার নাম শেফু।

শেফু? অর্থাৎ শেফালি। কী সুন্দর নাম! তোমরা দুজন চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

আমরা চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছি। আজ অন্য দিনের চেয়ে বেশি সময় লাগছে। একসময় চোখ মেললাম। মেয়েটি সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ বিষণ্ন। সে দুঃখিত গলায় বলল, আজ ঘরে কোনো মিষ্টি নেই। তোমাদের জন্যে একটা বই নিয়ে এসেছি। খুব ভালো বই। বইটা নিয়ে যাও। দাঁড়াও, আমার নাম লিখে দিই।

সে মুক্তার মতো হরফে লিখল, দুজন দেবশিশুকে ভালোবাসা ও আদরে—শুক্লাদি।

বই নিয়ে বাসায় ফিরলাম। বইটার নাম 'ক্ষীরের পুতুল'। লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাতায় পাতায় ছবি।

'ক্ষীরের পুতুল' হচ্ছে আমার প্রথম-পড়া 'সাহিত্য'। সাহিত্যের প্রথম পাঠ আমি আমার বাবা-মা'র কাছ থেকে পাইনি। বাবার বিশাল লাইব্রেরি ছিল। সেই লাইব্রেরির পুস্তকসংখ্যা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। সমস্ত বই তিনি তালাবন্ধ করে রাখতেন। বাবার লাইব্রেরির বই আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নাগালের বাইরে ছিল। বাবা হয়তো ভেবেছিলেন, এইসব বই পড়ার সময় এখনও হয়নি।

শুক্লাদি তা ভাবেননি। তিনি অসাধারণ একটি বই একটি বাচ্চা-ছেলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তার স্বপ্নজগতের দরজা খুলে দিলেন। স্বপ্নজগতের দরজা সবাই

খুলতে পারে না। দরজা খুলতে সোনার চাবির দরকার। ঈশ্বর যার-তার হাতে সেই চাবি দেন না। সে-চাবি থাকে অল্পকিছু মানুষের কাছে। শুক্লাদি সেই অল্পকিছু মানুষদের একজন।

শুক্লাদির সঙ্গে আমার ঐ বই পাওয়ার পর আর দেখা হয়নি। তিনি কলকাতার বেথুন কলেজে পড়াশোনা করতেন। ছুটি শেষ হবার পর কলকাতা চলে গেলেন। তার কিছুদিন পর প্রফেসর সাহেব বাড়ি বিক্রি করে ইন্ডিয়া চলে গেলেন। যিনি বাড়ি কিনলেন তিনি প্রথমে গাছগুলি সব কাটিয়ে ফেললেন। বাড়িটিকে ঘিরে যে-স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন।

কত-না নিঝুম দুপুরে এই শ্রীহীন বাড়ির গেটের কাছে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়েছি। গভীর দুঃখে আমার চোখ ভেঙে জল এসেছে।

বাসায় এসেই বসেছি ক্ষীরের পুতুল নিয়ে। এই বই নিয়ে বসলেই ভেঙে–যাওয়া স্বপ্ন ফিরে আসত। মুহূর্তে চলে যেতাম অন্য কোনো পৃথিবীতে। কী অদ্ভুত পৃথিবীই-না ছিল সেটি!

শুক্লাদির দেয়া ক্ষীরের পুতুল বইটি উনিশশো একাত্তর পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিল। একাত্তরের অনেক প্রিয় জিনিসের সঙ্গে বইটিও হারিয়েছি। কিন্তু সত্যি কি হারিয়েছি? হৃদয়ের নরম ঘরে যাদের স্থান দেয়া হয় তারা কি কখনো হারায়? কখনো হারায় না। শুক্লাদির কথা যখনই মনে হয় তখনই বলতে ইচ্ছা করে, 'জনম জনম তব তরে কাঁদিব।'

'ক্ষীরের পুতুল' বইটি আমার জীবনধারা অনেকখানি পালটে দিল। এখন আর দুপুরে ঘুরতে ভালো লাগে না। শুধু গল্পের বই পড়তে ইচ্ছে করে। কুয়োতলার লাগোয়া একটা ঘর, দুপুরের দিকে একেবারে নিরিবিলি হয়ে যায়। দরজা বন্ধ করে জানালায় হেলান দিয়ে গল্পের বই নিয়ে বসি। জানালার ওপাশে কাঁঠালগাছের গুচ্ছ। সেই কাঁঠালগাছে ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাক ডাকে। এ ছাড়া চারদিকে কোনো শব্দ নেই। অদ্ভুত নৈঃশব্দের জগৎ। এটা যেন চেনা-জানা পৃথিবী নয়, অন্য কোনো ভুবন।

বই-এ পাতার পর পাতা অতি দ্রুত উলটে যাচ্ছি। এইসব বই বাবার আলমিরা থেকে চুরি করা। মা জেগে ওঠার আগে রেখে দিতে হবে। ধরা পড়লে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। একদিন ধরা পড়লাম। বাবার হাতেই ধরা পড়লাম। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কী বই পড়ছিস? দেখি, দেখি বইটা।

তিনি বই হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বইয়ের নাম—'প্রেমের গল্প'। তিনি থমথমে গলায় বললেন, পড়েছিস এই বই?

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, হুঁ।

বুঝেছিস কিছু ?

হুঁ।

কী বুঝেছিস ?

কী বুঝেছি ব্যাখ্যা করতে পারলাম না। বাবা বই নিয়ে আলমিরায় তালাবন্ধ করে রাখলেন। আমি ভয়ে অস্থির। নিশ্চয়ই গুরুতর কোনো শাস্তির ব্যবস্থা হবে। সন্ধ্যাবেলা তিনি বললেন, কাপড় পরে আমার সঙ্গে চল।

আমি কোনো কথা না বলে কাপড় পরলাম। কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। তিনি রিকশা করে আমাকে নিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে। বই-এর এক বিশাল সংগ্রহ। যে-দিকে চোখ যায় শুধু বই, বই আর বই। আমাকে লাইব্রেরির মেম্বার করে দিলেন। শান্ত গলায় বললেন, এখানে অনেক ছোটদের বই আছে, আগে এইগুলি পড়ে শেষ কর। তারপর বড়দের বই পড়বি।

প্রথমদিনের দুটি বই নিজে পছন্দ করে দিলেন। দুটি বইয়ের একটির নাম মনে আছে—টম কাকার কুটির। কী অপূর্ব বই! এই বইটি পড়বার আনন্দময় স্মৃতি এখনও চোখে ভাসে। ঝুমঝুম করে বৃষ্টি পড়ছে। সিলেটের বৃষ্টি—ঢালাও বর্ষণ। আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে বই নিয়ে বসেছি। টম কাকার গল্প পড়তে পড়তে চোখে নেমেছে অশ্রুর বন্যা। সমস্ত হৃদয় জুড়ে একধরনের শূন্যতা অনুভব করছি। হঠাৎ করে মহৎ/সাহিত্যকর্মের মুখোমুখি হলে যা হয়, তা-ই হচ্ছে—প্রবল আবেগে চেতনা আলোড়িত হচ্ছে।

আমার বই পড়ার অভ্যাস মা খুব সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। প্রায়ই বিরক্ত হয়ে বলেন, এই ছেলে দিনরাত আউট বই পড়ে। যখন সবাই খেলাধুলা করছে সে অন্ধকারে বই নিয়ে বসেছে। চোখ নষ্ট হবে তো!

চোখ আমার সত্যি সত্যি খারাপ হল। যদিও তা বুঝতে পারলাম না। বাইরের পৃথিবী আবছা দেখি। আমার ধারণা, অন্য সবাইও তা-ই দেখে। ক্লাস ফাইভে উঠে প্রথম চশমা নিই। চোখের ডাক্তার আমার চোখ পরীক্ষা করে আঁতকে উঠে বললেন, এই ছেলে তো অন্ধের কাছাকাছি! এতদিন সে চালিয়েছে কীভাবে? প্রথম চশমা পরে আমিও হতভম্ব হয়ে ভাবি—চারদিকের জগৎ এত স্পষ্ট! কী আশ্চর্য! দূরের জিনিসও তা হলে দেখা যায়!

আগের কথায় ফিরে আসি।

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সদস্য হওয়ায় সবচে কষ্টে পড়ল আমার ছোট দুই ভাইবোন—শেফু এবং ইকবাল। মীরাবাজার থেকে একা এতদূরে হেঁটে যেতে ভালো লাগে না। আমি এদের সঙ্গে নিয়ে যাই। পথ আর ফুরাতে চায় না।

পথে দুতিন জায়গায় ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করতে বসি। আমার সব ক্লান্তি সব কষ্ট দূর হয়ে যায় যখন দুটি বই হাতে পাই। আনন্দে ঝলমল করতে থাকি। শেফু এবং ইকবাল আমার এই আনন্দে অংশগ্রহণ করতে পারে না। শুধুমাত্র আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে তাদের দিনের পর দিন কষ্ট করতে হয়।

আমাকে রোজ দুটি করে বই দিতে গিয়ে একদিন লাইব্রেরিয়ানেরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, এখন থেকে একটি করে বই নেবে, দুটো না। আর এইসব আজেবাজে গল্পের বই পড়ে কোনো লাভ নেই। এখন থেকে পড়বে জ্ঞানের কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল এইসব শিখতে হবে। নাও, আজকে এই বইটা নিয়ে যাও।

আমি খুব মন-খারাপ করে বইটা হাতে নিলাম। বইয়ের নাম 'জানবার কথা'। বাসায় এনে দুতিন পাতা পড়লাম। এতটুকুও আকর্ষণ করল না। পরদিন ফেরত দিতে গেছি। লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক বললেন, পড়েছ?

আমি বললাম, হুঁ।

তিনি হাত থেকে বই নিয়ে কয়েকটা পাতা উলটে বললেন, আচ্ছা বলো, গ্লেসিয়ার কী?

আমি বলতে পারলাম না। তিনি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, বাঁদর ছেলে—যাও, এই বই ভালোমতো পড়ে তারপর আসো।

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে আমি আর কখনো যাইনি। 'জানবার কথা' বইটিও ফেরত দেয়া হয়নি। বাসায় ফিরে 'জানবার কথা' কুটিকুটি করলাম, কিছুক্ষণ কাঁদলাম। আমি প্রচণ্ড অভিমানী হয়ে জন্মেছি। অভিমান নামক ব্যাপারটি কম নিয়ে জন্মানো ভালো। এই জিনিসটি আমাদের বড়ই কষ্ট দেয়।

বই পড়ার আগ্রহে সাময়িক ভাটা দেখা দিল। আগের জগতে ফিরে গেলাম—ঘুরে বেড়ানো। ইতিমধ্যে চুরিবিদ্যা খানিকটা রপ্ত হয়েছে। লক্ষ্য করেছি, মা ভাংতি পয়সা রাখেন তোশকের নিচে। সিকি, আধুলি, আনি-দুআনি—ঠিক কত আছে, সেই হিসেব তাঁর নেই। ভাংতি পয়সার মধ্যে সবচে ছোট হচ্ছে—সিকি। একবার একটা সিকি সরিয়ে সমস্ত দিন আতঙ্কে নীল হয়ে রইলাম। সারাক্ষণ মনে হল, এই বোধহয় মা বলবেন, সিকি কে নিয়েছে? মা তেমন কিছু করলেন না। পরদিন সেই সিকি নিয়ে এবং সঙ্গে ছোট বোনকে নিয়ে চায়ের স্টলে চা খেতে গেলাম। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বড়রা যেমন দোকানে চা খায়, আমরাও তেমনি খাব। দোকানদার নিশ্চয়ই দুই ক্ষুদে কাস্টমার পেয়ে বিস্মিত হয়েছিল। সে যত্ন করে আমাদের দুজনকে গ্লাসে করে দুকাপ চা দিল। একটা পরোটা ছিঁড়ে দুভাগ করে দুজনের হাতে দিল এবং কোনো পয়সা রাখল

না। হাতের সিকি হাতেই রয়ে গেল। অতঃপর দুজনে একটা রিকশায় উঠে পড়লাম। কোনো গন্তব্য নেই—যতদূর রিকশা যায়। তখন রিকশাভাড়া ছিল বাঁধা। শহরের এক মাথা থেকে আরেক মাথা যাওয়া যেত এক সিকিতে। রিকশাওয়ালা আমাদের জল্লারপাড়ের কাছে নামিয়ে দিল। সেখান থেকে মহানন্দে হেঁটে বাসায় ফিরলাম। মনে হল, চুরিবিদ্যা খুব খারাপ কিছু নয়।

মা'র তোশকের নিচ থেকে প্রায়ই পয়সা উধাও হতে লাগল। একদিন কাজের ছেলে রফিক চুরির জন্যে প্রচণ্ড বকা খেল। তোশকের নিচে পয়সা রাখাও বন্ধ হয়ে গেল। বড় কষ্টে পড়লাম। এখন একমাত্র ভরসা দেশের বাড়ি থেকে বেড়াতে-আসা মেহমানরা।

আমাদের বাসায় মেহমান লেগেই থাকত। দাদার বাড়ির দিকের মেহমান, মা'র বাড়ির দিকের মেহমান। কেউ আসত শহর দেখতে, কেউ শাহজালাল সাহেবের মাজার দেখতে, কেউবা চিকিৎসা করাতে। মেহমানরা দয়াপরবশ হয়ে এক আনা বা দুপয়সা বাড়িয়ে দিতেন—পৃথিবীটাকে বড়ই সুন্দর মনে হত। ছুটে যেতাম দোকানে। কত অপূর্ব সব খাবার—হজমি! দুপয়সায় অনেকখানি পাওয়া যেত, টক টক ঝাঁঝালো স্বাদ। খানিকটা মুখে দিলেই জিভ কালো কুচকুচে হয়ে যেত। এক আনায় পাওয়া যেত দুগোল্লা সরষে তেল মাখানো বিচি-ছাড়ানো তেঁতুল। বাদামভাজা আছে, বুটভাজা আছে। যদুমিয়ার দোকানে পাওয়া যেত দুধ-চকলেট। এক আনায় চারটা, তবে আমার জন্যে একটা ফাউ। পাঁচটা।

মিষ্টি পানের একটা দোকান ছিল, তার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই দোকানি ছোট একটা পান বানিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলত, ভাগ। কী সুস্বাদু ছিল সেই মিষ্টি পান!

গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম দেশের বাড়ির মেহমানদের জন্যে। মেহমান আসা মানেই আনন্দ। শহর দেখানোর জন্যে আমি চমৎকার গাইড। একদিন-না-একদিন তাঁরা রঙমহল সিনেমা হলে ছবি দেখতে যাবেন। আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে। আমাকে নেয়ার ব্যাপারে তাঁরা তেমন আপত্তিও করবেন না। কারণ আমার জন্যে আলাদা করে টিকিট করতে হবে না। আমি ছবি দেখব কোলে বসে, কিংবা দাঁড়িয়ে। বাড়িতে মেহমান থাকার আরেকটি বড় সুবিধা হচ্ছে সেই সময় মা'র শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যেত। বড় ধরনের অপরাধেও মা কঠিন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার শাস্তি ছাড়া অন্য শাস্তি দিতেন না।

মেহমানদের মধ্যে একজনের কথা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি মায়ের দিকের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। ভাটিঅঞ্চলের মানুষ। খুনের দায়ে হাজতে আছেন। জামিনে ছাড়া পেয়ে কয়েকদিন থাকতে এলেন আমাদের এখানে।

অসম্ভব রকমের রুগ্ণ একজন মানুষ। যক্ষ্মা নামের কালব্যাধিতে ধরেছে। সারাক্ষণ কাশছেন। কাশির সঙ্গে টাটকা রক্ত পড়ছে।

তিনি বাসায় এসেই মাকে ডেকে বললেন, রাজরোগে ধরেছে গো মা। এই ব্যাধি ছোঁয়াচে। তোমার ছেলেপুলের সংসার। ভেবেচিন্তে বলো, আমাকে রাখবে? তিন-চার দিন থাকতে হবে। হোটেলে থাকতে পারি, কিন্তু হোটেলে থাকতে ইচ্ছা করছে না। তুমি ভেবেচিন্তে বলো।

মা বললেন, আপনি অবশ্যই আমার এখানে থাকবেন।

খুব ভালো কথা। তা-ই থাকব। বেশিদিন বাঁচব না। যে-কয়টা দিন আছি পরিচিত মানুষদের মধ্যে থাকতে চাই। তবে মা আমি যে থাকব, আমার কিছু শর্ত আছে।

কী শর্ত?

নিজের মতো বাজার-সদাই করব। এর জন্যে মনে কষ্ট নিও না। আমার অনেক জিনিসের অভাব আছে, টাকাপয়সার অভাব নাই। কী মা, রাজি?

মাকে রাজি হতে হল। আমরা পরম বিস্ময়ে দেখলাম—মাত্র চারদিন যে-লোকটি থাকবে তার জন্যে বস্তাভরতি পোলায়ের চা আসছে, টিনভরতি ঘি, চিনি। দুপুরে প্রকাণ্ড একটা চিতলমাছ চলে এল, ঝাঁকাভরতি মুরগি।

তিনি নিজে এতসব খাবারদাবারের কিছুই খেলেন না। মাকে বললেন, আমাকে তিন চামুচ আলোচালের ভাত আর এক চামুচ ঘি দিও। এর বেশি আমি কিছু খেতে পারি না। আল্লাহ আমার রিজিক তুলে নিয়েছেন।

শৈশবে যে অল্পকিছু মানুষ আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল উনি ছিলেন তাদের একজন। ভাটিঅঞ্চলের জমিদারবংশের মানুষ। এঁদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় মানুষ একযোগে এঁদের বসতবাড়ি আক্রমণ করে। এঁরা তখন আত্মরক্ষার জন্যে কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে বন্দুক নিয়ে দোতলা থেকে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকেন। পঞ্চাশের মতো মানুষ আহত হয়, মারা যায় ছ'জন। জমিদারবাড়ির সকল পুরুষের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ আসামি হিসেবে সবাইকেই বেঁধে নিয়ে আসে। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত যে-মানুষটির কথা বলছি তিনিও আসামিদেরই একজন। পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিতে বলেছেন—বাড়ি যখন আক্রান্ত হয় তখন আমিই বন্দুক নিয়ে বের হই। আমি একাই গুলি করি—হত্যাকাণ্ডের সমস্ত দায়দায়িত্ব আমার। শাস্তি হলে আমার শাস্তি হবে। অন্য কারও নয়।

মজার ব্যাপার হল, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোনোই যোগ ছিল না। এই ধরনের স্বীকারোক্তি তিনি করেছেন অন্যদের বাঁচাবার জন্যে। তাঁর যুক্তি

হল—আমার যক্ষ্মা হয়েছে, আমি তো দুদিন পর এম্নিতেই মারা যাচ্ছি। ফাঁসিতেই নাহয় মরলাম। অন্যরা রক্ষা পাক। তা ছাড়া বাকি সবারই বৌ-ছেলেমেয়ে আছে। আমি চিরকুমার মানুষ, আমি বেঁচে থাকলেই কী, মরলেই কী?

যক্ষ্মা রুগির চোখ এম্নিতে উজ্জ্বল হয়। ওঁর চোখ আমার কাছে মনে হল ঝিকমিক করে জ্বলে। সারাক্ষণ ধবধবে সাদা বিছানায়, সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে মূর্তির মতো বসে থাকেন। আমি বড়ই বিস্ময় অনুভব করি। একদিন হাত-ইশারা করে আমাকে ডাকলেন, আমি এগিয়ে যেতেই তীব্র গলায় বললেন, তুই সবসময় আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করিস কেন? খবরদার, আর আসবি না। ছোট পুলাপান আমি পছন্দ করি না।

আহত ও অপমানিত হয়ে তাঁর ঘর থেকে আমি বের হয়ে আসি, কিন্তু তাঁর প্রতি যে-গভীর ভালোবাসা লালন করি তার হেরফের হয়নি। মামলা চলাকালে জেল-হাজতে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার মনে আছে, তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমি বালিশে মুখ গুঁজে দীর্ঘ সময় কাঁদি।

## সাহিত্য বাসর

বাবার অসংখ্য বাতিকের একটি হল—সাহিত্য-বাতিক। মাসে অন্তত দুবার বাসায় 'সাহিত্য বাসর' নামে কী যেন হত। কী যেন হত বলছি এই কারণে যে, আমরা ছোটরা জানতাম না কী হত। আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সাহিত্য চলাকালীন আমরা হৈচৈ করতে পারতাম না, উঁচু গলায় কথা বলতে পারতাম না, শব্দ করে হাসতেও পারতাম না। এর থেকে ধারণা হত, বসার ঘরে তাঁরা যা করছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে একদিন খানিকটা শুনলাম। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হল। একজন খুব গম্ভীর মুখে একটা কবিতা পড়ল। অন্যরা তার চেয়েও গম্ভীর মুখে শুনল। তারপর কেউ বলল, ভালো হয়েছে, কেউ বলল মন্দ, এই নিয়ে তর্ক বেধে গেল। নিতান্তই ছেলেমানুষি ব্যাপার। একদিন একজনকে দেখলাম রাগ করে তার লেখা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। অম্নি দুজন ছুটে গেল তাকে ধরে আনতে। ধরে আনা হল। বয়স্ক একজন মানুষ অথচ হাউমাউ করে কাঁদছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড! কাণ্ড এখানে শেষ না। ছিঁড়ে কুচিকুচি করা কাগজ এরপর আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো হতে লাগল। সেই লেখা পড়া হল, সবাই বলল, অসাধারণ। এই হচ্ছে

বাবার প্রাণপ্রিয় সাহিত্য বাসর।

সারাটা জীবন তিনি সাহিত্য সাহিত্য করে গেলেন। কতবার যে তিনি ঘোষণা করেছেন, এবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সাহিত্যে মনোনিবেশ করবেন! চাকরি এবং সাহিত্য দুটো একসঙ্গে হয় না।

ট্রাংকে বোঝাই ছিল তাঁর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি। গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ। থরেথরে সাজানো। বাবার সাহিত্যপ্রেমের স্বীকৃতি হিসেবে আমাদের বসার ঘরে বড় একটা বাঁধানো সার্টিফিকেট ঝোলানো, যাতে লেখা—'ফয়জুর রহমান আহমেদকে সাহিত্য সুধাকর উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।'

এই উপাধি তাঁকে কারা দিয়েছে, কেন দিয়েছে কিছুই এখন মনে করতে পারছি না। শুধু মনে আছে বাঁধানো সার্টিফিকেটটির প্রতি বাবার মমতার অন্ত ছিল না। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিফলকে আমি এই উপাধি এবং শোকগাথায় রবীন্দ্রনাথের দুলাইন কবিতা ব্যবহার করি।

দূরদূরান্ত থেকে কবি-সাহিত্যিকদের হঠাৎ আমাদের বাসায় উপস্থিত হওয়া ছিল আরেক ধরনের ঘটনা। বাবা এঁদের কাউকে নিমন্ত্রণ করে আনাতেন না। তাঁর সামর্থ্য ছিল না, তিনি যা করতেন তা হচ্ছে মনিঅর্ডার করে তাঁদের নামে পাঁচ টাকা বা দশ টাকা পাঠিয়ে কুপনে লিখতেন—

জনাব,

আপনার ....কবিতাটি .... পত্রিকার.... সংখ্যায় পড়িয়া মনে বড় তৃপ্তি পাইয়াছি। উপহার হিসেবে আপনাকে সামান্য কিছু অর্থ পাঠাইলাম। উক্ত অথ গ্রহণ করিলে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

ইতি প্রতিভামুগ্ধ—

ফয়জুর রহমান আহমেদ

(সাহিত্য সুধাকর)

ঐ কবি নিশ্চয়ই তাঁর কাব্যের জন্যে নানান প্রশংসাবাক্য শুনেছেন, কিন্তু মনিঅর্ডারে টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা না ঘটারই কথা। প্রায় সময়ই দেখা যেত, আবেগে অভিভূত হয়ে যশোহর বা ফরিদপুরের কোনো কবি বাসায় উপস্থিত হয়েছেন।

এমনিভাবে উপস্থিত হলেন কবি রওশন ইজদানী। পরবর্তীকালে তিনি খাতেমুন নবীউন গ্রন্থ লিখে আদমজী পুরস্কার পান। যখনকার কথা বলছি তখন তাঁর কবিখ্যাতি তেমন ছিল না।

আমার পরিষ্কার মনে আছে, লুঙ্গি-পরা ছাতা-হাতে এক লোক রিকশা থেকে

নেমে ভাড়া নিয়ে রিকশাওয়ালার সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। জানলাম, ইনি বিখ্যাত কবি রওশন ইজদানী। আমাদের বলে দেয়া হল যেন হৈচৈ না করি, চিৎকার না করি। ঘরে একজন কবি বাস করছেন। কবিতা লেখার মুডে থাকলে সেই মুডের ক্ষতি হবে।

দেখা গেল, কবি সারা গায়ে সরিষার তেল মেখে রোদে গা মেলে পড়ে রইলেন। আমাকে ডেকে বললেন—এই, মাথা থেকে পাকা চুল তুলে দে।

কবি-সাহিত্যিকরা আলাদা জগতে বাস করেন, মানুষ হিসেবে তাঁরা অন্যরকম বলে যে প্রচলিত ধারণা আছে কবি রওশন ইজদানীকে দেখে আমার মনে হল ঐ ধারণা ঠিক না। তাঁরা আর দশটা মানুষের মতোই, আলাদা কিছু না।

আমার আদর-যত্নে, খুব সম্ভব পাকা চুল তোলার দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমাকে একদিন ডেকে বললেন, খাতা-কলম নিয়ে আয়, তোকে কবিতা লেখা শিখিয়ে দিই।

আমি কঠিন গলায় বললাম, আমি কবিতা লেখা শিখতে চাই না।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, তাহলে কী শিখতে চাস?

কিছুই শিখতে চাই না।

আসলেই তা-ই। শৈশবে কারওর কাছ থেকে আমি কিছুই শিখতে চাইনি। এখনও চাই না। অথচ আশ্চর্য, আমার চারপাশে যাঁরা আছেন তাঁরা ক্রমাগত আমাকে শেখাতে চান। অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, ভাষা এবং বাংলা বানানের শিক্ষকরা আমার চারপাশে আছেন। পণ্ডিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে আঠারো-উনিশ বছরের তরুণী সবাই আমার শিক্ষক। সবাই আমাকে শেখাতে চান। হয়তো ভালোবাসা থেকেই চান, কিন্তু আমার কিছুই শিখতে ইচ্ছা করে না। জানতে ইচ্ছা করে না। 'জানবার কথা' নামের একটি বই শৈশবেই ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলেছিলাম এই কারণেই।

## পদ্মপাতার জল

আমাদের পাশের বাসায় থাকত নাদু দিলুরা।

তারাও আমাদেরই মতোই অল্পআয়ের বাবা-মা'র পুত্রকন্যা। সবাই একসঙ্গে ধুলোমাটিতে গড়াগড়ি করে বড় হচ্ছি। ওমা একদিন শুনি, ওরা বড়লোক হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে ওদের কাপড়চোপড় পালটে গেল। কথাবার্তার ধরন-ধারণও বদলে গেল। এখন আর ওরা দাঁড়িয়াবান্দা কিংবা চি-বুড়ি খেলার জন্যে আমাদের কাছে আসে না।

ঈদ উপলক্ষে ওরা নতুন কাপড় তো পেলই সেইসঙ্গে পেল ট্রাই সাইকেল। ট্রাই সাইকেলটি শিশুমহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। আমিও এর আগে এই জিনিস দেখিনি। কী চমৎকার ছোট্ট একটা রিকশা! এর মধ্যে আবার বেলও আছে। টুং টুং করে বাজে। এই বিস্ময়কর বাহনটিতে একবার শুধু চড়তে পারার দুর্লভ সৌভাগ্যের জন্যে আমি তখন আমার সমস্ত পৃথিবী দিয়ে দিতে পারি। চেষ্টা করে বিফল হলাম। সবসময় নাদু দিলুর সঙ্গে একজন কাজের মেয়ে থাকে। আমি কাছে গেলেই সে খ্যাঁক করে ওঠে। হাত দিয়ে একটু দেখার অনুমতি চাইলাম, সেই অনুমতিও পাওয়া গেল না। আমরা শিশুরা সমস্ত কাজকর্ম ভুলে ট্রাই সাইকেল ঘিরে গোল হয়ে বসে রইলাম। অনেক চিন্তা করে দেখলাম ট্রাই সাইকেল কেনার কথা বাবাকে কি বলা যায়? মনে হল সেটা ঠিক হবে না। বাবার তখন চরম আর্থিক সমস্যা যাচ্ছে। তাঁর সবচে আদরের ছোট বোন অসুস্থ। সেই বোনের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁর বহন করতে হচ্ছে। ঈদে আমরা ভাইবোনেরা কোনো কাপড়চোপড় পাইনি। শেষ মুহূর্তে বাবা আমাদের তিন ভাইবোনকে তিনটা প্লাস্টিকের চশমা কিনে দিলেন, যা চোখে দিলে আশেপাশের জগৎ নীলবর্ণ ধারণ করে। কাপড় না পাওয়ার দুঃখ রঙিন চশমায় ভুললাম। তারচেও বড় কথা, দিলু এই চশমার বিনিময়ে আমাকে তার ট্রাই সাইকেল খানিকটা স্পর্শ করার দুর্লভ সুযোগ দিল। সে বড়ই আনন্দময় অভিজ্ঞতা।

যতই দিন যেতে লাগল এদের রমরমা সমসমা বাড়তেই লাগল। শুনলাম, তাদের জন্যে বিশাল দুতলা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। বাড়ি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত কোনোরকম কষ্টেসৃষ্টে এখানেই থাকবে। এর মধ্যে এই দুই ভাইবোনের জন্মদিন হল। জন্মদিন বলে যে একটা ব্যাপার আছে আমার তা জানা ছিল না। এই দিনে উৎসব হয়। খানাদানা হয়—উপহার নিয়ে লোকজন আসে কে জানত! আমরা অভিভূত।

শেফু একদিন বাবাকে গিয়ে বলল, আমার জন্মদিন করতে হবে।

বাবা খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, ঠিক আছে মা, করা হবে। কিন্তু শুধুই একবার। এই উৎসব আমি দ্বিতীয়বার করব না। তোমরা বড় হবার চেষ্টা করো। অনেক বড়, যাতে সারা দেশের মানুষ তোমাদের জন্মদিনের উৎসব করে। বাবা-মা'র করতে না হয়।

শেফু বলল সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে বড় হবার।

আমি দেখলাম সুযোগ ফসকে যাচ্ছে। শুধু শেফুর জন্মদিন হবে আমার হবে না, এ কেমন কথা! আমি গম্ভীর গলায় বললাম, বাবা, আমিও খুব বড় হবার চেষ্টা

করব। আমারও জন্মদিন করতে হবে। বাবা বললেন, আচ্ছা তোমারও হবে।

শুধু ইকবাল ঘোষণা করল সে বড় হতে চায় না। ছোটই থাকতে চায়। তার জন্মদিন লাগবে না।

আমরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। নভেম্বরের ৯ তারিখ শেফুর জন্মদিন। দেখতে দেখতে ৯ তারিখ এসে পড়ল। আমরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করলাম, এই উপলক্ষে কাউকে বলা হল না। বাবা বললেন, আমরা নিজেরা নিজেরা উৎসব করব। কাউকে বলব না।

পায়েস ছাড়া অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য তৈরি হল না। আমাদের মন ভেঙে গেল। সন্ধ্যার পর জন্মদিনের উৎসব শুরু হল। বাবা 'বীরপুরুষ' কবিতা আবৃত্তি করলেন। প্রাণেশ কাকু তিনটা গান গাইলেন। পায়েস খাওয়া হল। তারপর বাবা ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়ে শেফুর হাতে একটা উপহারের প্যাকেট তুলে দিলেন। সেই উপহার দেখে আমাদের সবার বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হয়ে গেল। আমার দরিদ্র বাবা খুবই দামি উপহার কিনেছেন। চীনেমাটির চমৎকার খেলনা 'টি সেট', যা দেখলে একালের শিশুদেরও চোখ কপালে উঠে যাবার কথা।

বাবা বললেন,পছন্দ হয়েছে মা?

শেফু কাঁদতে কাঁদতে বলল, এত সুন্দর জিনিস সে তার জীবনে দেখেনি। আনন্দে সারারাত সে ঘুমাতে পারল না। বারবার বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দেখে আসে টি সেট ঠিকঠাক আছে কি না। সেই রাতে আমি নিজেও উদ্বেগে ঘুমুতে পারলাম না। আর মাত্র তিন দিন পর আমার জন্মদিন। নাজানি কী অপেক্ষা করছে আমার জন্যে! গোপনসূত্রে খবর পেলাম, আমার জন্যে দশগুণ ভালো উপহার অপেক্ষা করছে। খবর দিলেন মা। মা'র খবর খুবই নির্ভরযোগ্য।

জন্মদিন এসে গেল। গান, কবিতা আবৃত্তির পালা শেষ হবার পর আমার হাতে উপহারের প্যাকেট তুলে দেয়া হল। প্যাকেট খুলে দেখি একটা বাঁধানো ফ্রেমে দীর্ঘ একটি কবিতা। বাবা ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে একটি কবিতা লিখে ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিয়ে এসেছেন। কবিতার প্রথম দুটি চরণ—

সাতটি বছর গেল পরপর আজিকে পরেছো আটে,
তব জন্মদিন নয়ত মলিন ভয়াল বিশ্ব হাটে ...

বাবা খুবই আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, উপহার পছন্দ হয়েছে? অনেক কষ্টে কান্না চাপা দিয়ে বললাম, হ্যাঁ।

তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে পছন্দ হয় নাই।

আমি চুপ করে রইলাম।

বাবা খানিকক্ষণ শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, এই

উপহার এখন তোর কাছে সামান্য মনে হচ্ছে। এমন একদিন আসবে যখন আর সামান্য মনে হবে না।

বাবা কবি ছিলেন না। হৃদয়ের তীব্র আবেগ-প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তিনি কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর অতি আদরের ছোট বোনের মৃত্যুর খবর পাবার পর তিনি কাঁদতে কাঁদতে কবিতা লিখতে বসেছেন। চোখের জলে লেখা দীর্ঘ কবিতা হয়তো শুদ্ধতম কবিতা হয়নি। কিন্তু যে-আবেগের তাড়নায় কলম হাতে নিয়েছিলেন সেই আবেগে কোনো খাদ ছিল না। বাবার কাছ থেকে প্রথম শিখলাম, মনে তীব্র ব্যথা কমানোর একটি উপায় হচ্ছে কিছু লেখা, যে-লেখা ব্যক্তিগত দুঃখকে ছড়িয়ে দেয় চারদিকে।

বাবা হচ্ছেন আমার দেখা প্রথম কবি।

আমার দেখা দ্বিতীয় কবি হচ্ছেন আমাদের বড়মামা ফজলুল করিম। তিনিও আমাদের বাসায় থাকতেন এবং এম. বি. কলেজে আই. এ. পড়তেন। আমার মেজো চাচা যেমন প্রতি বছর পরীক্ষা দিয়ে ফেল করতেন, বড়মামা ফেল করতেন পরীক্ষা না দিয়ে। পরীক্ষা না দেবার চমৎকার সব যুক্তি বের করতেন। এইসব যুক্তিতে অতি সহজেই মা'কে কাবু করে ফেলতেন।

পরীক্ষার আগের দিন মুখ গম্ভীর করে বলতেন, বুবু, এই বছরও পরীক্ষা দেব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

কেন? এই বছর আবার কী হল?

গত বৎসর পাশের হার বেশি ছিল, কাজেই এই বৎসর কম হবে। পরীক্ষা দিলে ফেল করতে হবে। আগামী বৎসর চেষ্টা চালাব ইনশাল্লাহ।

এই বৎসর পরীক্ষাটা দে, পাশ-ফেল পরের ব্যাপার।

আরে না! পরীক্ষা দিয়ে এনার্জি লস করার কোনো মানে হয় না।

বলাই বাহুল্য, পরের বৎসর তিনি পরীক্ষা দেন না। কারণ রুটিন খুব খারাপ হয়েছে। গ্যাপ কম। তবুও দিতেন, কিন্তু এনার্জি লসের ভয়ে দিচ্ছেন না। বড়মামা সব এনার্জি জমা করে রাখলেন এবং শুভক্ষণে পুরো এনার্জি নিয়ে জনৈকা তরুণীর প্রেমে পড়ে গেলেন। প্রেমের আবেগে কবিতার পর কবিতা বের হতে লাগল। আমার উপর দায়িত্ব পড়ল এইসব কবিতা যথাস্থানে পৌঁছে দেবার। আমি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগলাম।

তরুণীর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় প্রেমে ভাটার টান ধরল। গোটা পঞ্চাশেক বিরহের কবিতা লিখে বড়মামা হৃদয়যাতনা কমালেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বড়মামার সেইসব কবিতা কিন্তু বেশ ভালো ছিল বলে আমার ধারণা। তিনি এইসব কবিতা প্রকাশ করার ব্যাপারে কোনোরকম আগ্রহ দেখাননি কিংবা

পরবর্তী সময়ে কবিতা লেখার চেষ্টাও করেননি। তাঁর ভাবটা এরকম, এইসব কবিতা তিনি শুধু দুজনের জন্যেই লিখেছেন—তৃতীয় কারওর জন্যে নয়।

আমি নিজে নানাভাবে বড়মামার কাছে ঋণী। গল্প বলে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর এই ক্ষমতা আমাকে বারবার বিস্মিত করত। একই গল্প যখন বড়মামার কাছে শুনতাম, তখন অন্যরকম হয়ে যেত। এর কারণ বুঝতে পারতাম না, তবে কারণ নিয়ে ভাবতাম এটা মনে আছে। জীবনের প্রথম ছবি আঁকা তাঁর কাছ থেকেই শিখি। তিনি হাতি আঁকার চমৎকার একটা সহজ কৌশল শিখিয়ে দিলেন। এই কৌশলে আমি তিন হাজারের মতো হাতি এক মাসের মধ্যে এঁকে ফেলি। বাড়ির সাদা দেয়াল পেনসিলে-আঁকা হাতিতে হাতিময় হয়ে যায়।

তাঁর একটা সাইকেল ছিল। সারাদিন সাইকেলে করে ঘুরতেন। মাঝে মাঝে আমাকে পেছনে বসিয়ে বেড়াতে বের হতেন। সাইকেল চলত ঝড়ের গতিতে। এই সাইকেল বড়মামার প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে একদিন মোটরসাইকেল হয়ে গেল। যখনই সাইকেল চলে ভটভট শব্দ হয়। লোকজন অবাক হয়ে তাকায়। দেখতে সাইকেল অথচ শব্দ হচ্ছে মোটরসাইকেলের, ব্যাপারটা কী? ব্যাপার কিছুই না, দুটুকরা শক্ত পিসবোর্ড সাইকেলের সঙ্গে এমনভাবে লাগানো যে চাকা ঘোরামাত্র স্পোকের সঙ্গে পিসবোর্ডের ধাক্কা লেগে ভটভট শব্দ হয়। শিশুরা প্রতিভার সবচেয়ে বড় সমঝদার। আমরা বড়মামার প্রতিভার দীপ্তি দেখে বিস্মিত। আমাদের বিস্ময় আকাশ স্পর্শ করল যখন তিনি হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করলেন। হাঙ্গার স্ট্রাইকের কারণ মনে নেই, শুধু মনে আছে দরজার গায়ে বড় বড় করে লেখা—"আমরণ অনশন। নীরবতা কাম্য।" তিনি একটা খাটে শবাসনের ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন। বাবা পুরো ব্যাপারটায় মজা পেয়ে খুব হাসাহাসি করছেন। বড়মামা তাতে মোটেই বিচলিত হচ্ছেন না। তাঁর হাঙ্গার স্ট্রাইক ভাঙানোর কোনো উদ্‌যোগ নেয়া হল না। একদিন কাটল, দুদিন কাটল, তৃতীয় দিনও পার হল। তখন সবার টনক নড়ল। মা কান্নাকাটি শুরু করলেন। বাড়িতে টেলিগ্রাম গেল। চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় বড়মামা এক গ্লাস শরবত খেয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন এবং গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন—এদেশে থাকবেন না। কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে এদেশে থাকা সম্ভব নয়। তিনি বিলেত যাবেন।

তখন বিলেত যাওয়া খুব সহজ ছিল। দলেদলে সিলেটিরা বিলেত যাচ্ছে। মামারও পাসপোর্ট হয়ে গেল। তিনটি নতুন স্যুট বানানো হল। মামা স্যুট পরে ঘোরাফেরা করেন। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। কাঁটাচামচ দিয়ে ভাত-মাছ খান। দেখতে বড় ভালো লাগে।

শেষ পর্যন্ত বিলেত যাওয়া হল না। মামা বললেন—আরে দূর দূর, দেশের উপর জিনিস নাই। বিদেশ গিয়ে আমি ঘাস কাটব নাকি? আমি ভালোই আছি। বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি তা হলে যাচ্ছ না?

জি না।

কী করবে কিছু ঠিক করেছ?

আই. এ. পরীক্ষা দেব। এইবার উড়া-উড়া শুনেছি ম্যাক্সিমাম পাশ করবে। পরীক্ষা অবশ্য দিলেন না, কারণ পরীক্ষার আগে-আগে খবর পেলেন, এইবার কোশ্চেন খুব টাফ হবে। গতবার ইজি হয়েছিল, এইবার টাফ। টাফ কোশ্চেনে পরীক্ষা দেয়ার কোনো মানে হয় না।

তিনি একটা ক্যারামবোর্ড কিনে ফেললেন। মামা এবং চাচা দুজনে মিলে গভীর রাত পর্যন্ত টুকুস টুকুস করে ক্যারাম খেলেন। বড় সুখের জীবন তাঁদের।

আমার জীবনও সুখের, কারণ বাসার প্রধান শাসক বাবা অনুপস্থিত। তিনি প্রমোশন পেয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়েছেন। তাঁকে বদলি করা হয়েছে দিনাজপুরের জগদলে। সেই সময় বর্ডাররক্ষার দায়িত্ব ছিল পুলিশের উপর। বাবা চলে গেলেন বর্ডারে। আমার পূর্ণ স্বাধীনতা। কারওরই কিছু বলার নেই।

সেই সময় দেশে বড় ধরনের খাদ্যাভাব দেখা দিল। ভয়াবহ অবস্থা। হাজার হাজার মানুষ খাবারের সন্ধানে শহরে জড়ো হয়েছে। থালা-হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে।

সিলেট শহরে অনেকগুলি লঙ্গরখানা খোলা হল। লঙ্গরখানায় বিরাট ডেকচিতে খিচুড়ি রান্না করা হয়। ক্ষুধার্ত মানুষদের একবেলা খিচুড়ি খাওয়ানো হয়।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওদের খাওয়া দেখি। কলার পাতা কেটে লাইন ধরে সবাই বসে। প্রত্যেকের পাতায় দুহাতা করে খিচুড়ি দেয়া হয়। কত আনন্দে, কত আগ্রহ নিয়েই-না তারা সেই খিচুড়ি খায়! ওদের আনন্দে ভাগ বসানোর জন্যই হয়তোবা এক দুপুরে কলার পাতা নিয়ে ওদের সঙ্গে খেতে বসে গেলাম। সেই খিচুড়ি অমৃতের মতো লাগল। এর পর থেকে রোজই দুপুরবেলায় লঙ্গরখানায় খেতে যাই। একদিন বোনকেও নিয়ে গেলাম। সেও মহানন্দে কলার পাতা নিয়ে আমার সঙ্গে বসে গেল। খাওয়ার মাঝামাঝি পর্যায়ে এক ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে আমাদের দু-ভাইবোনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে বললেন, এরা কারা?

ধরা পড়ে গেলাম। কানে ধরে আমাদের দুজনকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হল।

আমার মা ক্রমাগত কাঁদতে লাগলেন। লঙ্গরখানায় খাওয়ার অপমানে তাঁর নাকি মাথা কাটা যাচ্ছে। লঙ্গরখানায় আমি পাতা পেতে খেয়েছি এতে লজ্জিত বা অপমানিত বোধ করার কী আছে তা আমি ঐদিন বুঝতে পারিনি। আজও পারি না।

নিঃসন্তান গনি চাচার জীবনে এই সময় একটি বড় ঘটনা ঘটল। এক ভিখিরি-মা ছেলে কোলে নিয়ে এসেছে ভিক্ষা করতে। ফুটফুটে ছেলে। গনি চাচার ছেলেটাকে বড়ই পছন্দ হল। তিনি প্রস্তাব দিলেন ছেলেটাকে তিনি আদরযত্নে বড় করবেন, তার বিনিময়ে ভিখিরি-মা দশ টাকা পাবে। কিন্তু কোনোদিন এই ছেলেকে তার ছেলে বলে দাবি করতে পারবে না। মা রাজি হয়ে গেল।

এই ঘটনা আমার মনে বড় ধরনের ছাপ ফেলে।

এখনও চোখের সামনে স্পষ্ট দেখি, ভিখিরি-মা মুখ কালো করে ঘরের বারান্দাতে বসে আছে। গনি চাচার স্ত্রী তার ছেলে-কোলে বারান্দায় এসে ধমকাচ্ছেন—কী চাও তুমি? তোমাকে না বলেছি, কখনো আসবে না! কেন এসেছ?

ব্যথিত মা করুণচোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে উঠে চলে যাচ্ছে।

ভিখিরিণীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে গনি চাচা কয়েকবার বাড়িবদল করলেন। কোনো লাভ হল না। যেখানেই যান সেখানেই মা উপস্থিত হয় সারাদিন বারান্দায় বসে থাকে।

শেষটায় গনি চাচা চেষ্টা-চরিত্র করে সিলেট থেকে বদলি হয়ে গেলেন। মৌলভী- বাজার। হতদরিদ্র মা'র হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন একটি শিশু। আমার তখন বয়স অল্প, খুবই অল্প। পৃথিবীর জটিলতা বোঝার বয়স নয়, তবুও মনে হল—এটা অন্যায়। খুব বড় ধরনের অন্যায়। ঐ ভিখিরিণী-মা'র সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দেখা হত। আমি তার পেছনে পেছনে হাঁটতাম। বিড়বিড় করে সে নিজের মনে কথা বলত। নিজের দুপাশে থুথু ফেলতে ফেলতে এগুত। হয়তো তার মাথা-খারাপ হয়েছিল। একজন ভিখিরিণীর মাথা-খারাপ হওয়া এমন কোনো বড় ঘটনা নয়। জগৎসংসারের তাতে কিছুই যায় আসে না। পৃথিবী চলে তার নিজস্ব নিয়মে। সেইসব নিয়ম জানার জন্য একধরনের ব্যাকুলতা আমার মধ্যে হয়তো তৈরি হয়েছিল। অনেক ধরনের প্রশ্ন মনে আসত। কাউকে করতে পারতাম না। প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের মনেই খুঁজতে হত।

মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়—এই প্রশ্নটা একদিন মনে এল। ভালো

মানুষেরা বেহেশতে, খারাপ মানুষেরা দোজখে—এ সহজ উত্তর মানে ধরল না। মনে হল—উত্তর এত সহজ নয়। মৃত্যু-সম্পর্কিত জটিল প্রশ্নটি মনে আসার কারণ আছে। কারণটা বলি।

একদিন সিলেট সরকারি হাসপাতালের সামনে দিয়ে আসছি। হঠাৎ দেখি নর্দমায় একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। লোকজন ভিড় করে দেখছে। কৌতূহল মিটে গেলে চলে যাচ্ছে। আমিও দেখতে লাগলাম। মৃতদেহ দেখে আমার শরীর কাঁপতে লাগল। কারণ মৃত মানুষটির ঠোঁটে হাসি। তার চোখ বন্ধ, কিন্তু হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকে আছে। দেখেই মনে হয় কোনো-একটা মজার ঘটনায় চোখ বন্ধ করে সে হাসছে। আমার বুকে ধক করে ধাক্কা লাগল।

দৌড়ে পালিয়ে এলাম।

মৃতদেহটির হাসিহাসি-মুখের ছবি নিজের মন থেকে কিছুতেই মুছতে পারলাম না। বিকেলে আবার দেখতে গেলাম। মৃতদেহ আগের জায়গাতেই আছে। তার মুখের হাসিরও কোনো হেরফের হয়নি।

পরদিন আবার গেলাম। লাশ সরানো হয়নি। তবে মুখের হাসি আর চোখে পড়ল না। অসংখ্য লাল পিঁপড়ায় সারা শরীর ঢাকা। লোকটির গায়ে যেন লাল রঙের একটা চাদর। খুব ইচ্ছা করল চাদর সরিয়ে তার মুখটি আরেকবার দেখি। দেখি, এখনও কি সেই মুখে হাসি লেগে আছে?

আমি বাসায় ফিরলাম কাঁদতে কাঁদতে। বাসায় ফিরেই শুনি, বাবার চিঠি এসেছে—আমরা সিলেটে আর থাকব না। চলে যাব দিনাজপুর, জায়গাটার নাম জগদল। মৃত মানুষটির কথা আর মনে রইল না। আনন্দে লাফাতে লাগলাম।

"মৃত লোকটির কথা আর মনে রইল না"—বলাটা বোধহয় ঠিক হল না। মনে ঠিকই রইল, তবে চাপা পড়ে গেল। একমাত্র শিশুরাই পারে সব ঘটনা সহজ ভঙ্গিতে গ্রহণ করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে। তারা একটি স্মৃতি থেকে অতি দ্রুত চলে যেতে পারে অন্য স্মৃতিতে। সব আলাদা আলাদা রাখা। ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। মাঝে মাঝে ঢাকনার মুখ তুলে দেখে নেয় সব ঠিকঠাক আছে কি না। কোনোকিছুই সে নষ্ট করতে বা ফেলে দিতে রাজি না।

কষ্টকর স্মৃতি মুছে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা আমি শুধু বড়দের মধ্যেই দেখি। শিশুদের মধ্যে দেখি না।

## আমার বন্ধু উনু

উনুর সঙ্গে আমার পরিচয় ফুটবল খেলার মাঠে। রোগা টিঙটিঙে একটা ছেলে—বড় বড় চোখ, খাদা নাক, মাথাভরতি ঝাঁকড়া চুল।

দুদলে তুমুল খেলা চলছে। আমি মাঠের বাইরে। গায়ে জ্বর বলে খেলতে পারছি না। জ্বর এমন বাড়াবাড়ি যে বসে থাকতে পারছি না আবার উঠে চলে যেতেও পারছি না। এমন সময় উনুকে লক্ষ্য করলাম। সে খুব মন দিয়ে ঘাস খাচ্ছে।

সত্যি সত্যি ঘাস খাচ্ছে। দুআঙুলে ঘাসের কচি পাতা দ্রুত তুলে চপচপ শব্দে চিবিয়ে খাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, ঘাস খাচ্ছ কেন?

সে গম্ভীর গলায় বলল, আমার ইচ্ছা।

বলে পুরো সুফি-সাধকদের নির্লিপ্ততা নিয়ে ঘাস চিবুতে লাগল। এমনভাবে চিবুচ্ছে যেন অতি উপাদেয় কোনো খাবার। তার খাওয়া দেখে জিভে পানি চলে আসে। আমি কৌতূহল সামলাতে পারলাম না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম, ঘাস খাচ্ছ কেন?

সে উদাস গলায় বলল, ভাইটামিন আছে।

এরকম একটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব না হওয়ার কোনো কারণই নেই। দশ মিনিটের মাথায় আমরা জন্মের বন্ধু হয়ে গেলাম। সে শিখিয়ে দিল ঘাসের কোন অংশ খেতে হয়, কোন অংশ খেতে হয় না। দুটা পাতার মাঝখানে সুতার মতো যে-ঘাসটা বের হয় সেটাই খাদ্য, তবে ডগার খানিকটা বাদ দিতে হবে। ডগাটা বিষ।

উনু আমার চেয়ে এক ক্লাস উপরে পড়ে। আমাদের স্কুলে না, অন্য কী-একটা স্কুলে। তার মা নেই, বাবার সঙ্গে থাকে। বাবা প্রতিদিন রুটিন করে উনুকে দুবেলা মারেন। স্কুল থেকে ফিরে আসার পর একবার, সন্ধ্যাবেলা খেলার মাঠ থেকে ফিরে আসার পর একবার। সেই মারও দর্শনীয় মার। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, মারপর্ব শেষ হবার পরই দুজনই অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যেন কিছুই হয়নি।

উনুর বাবা ছোট চাকরি করতেন। বাসার সাজসজ্জা অতি দরিদ্র। বাঁশের বেড়ার ঘর। পাশেই ডোবা। ময়লা নোংরা পানি। খেলা শেষ করে বাসায় ফিরে উনু সেই নোংরা পানিতে দিব্যি হাত-মুখ ধুয়ে ফেলে।

উনুর বাবাকে মানুষ হিসেবে আমার খুব পছন্দ হল। ছোটদের সঙ্গে কথা বলেন এমনভাবে যেন তারা ছোট না। তাঁর সমবয়স্ক মানুষ। আমাকে একদিন বললেন, এই যে আই আই চুন্দ্রীগর সাহেব দেশের ভার নিল, লোকটা কেমন?

তোমার কি মনে হয় উনিশ-বিশ কিছু হবে?

আই আই চুন্দ্রীগর কে, সে কবেই-বা দেশের ভার নিল কিছুই জানি না। তবু খুব বুঝদার মানুষের মতো মাথা নাড়লাম। মুখে বললাম, হবে।

উনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, মনে হয় না। সব এক। দেয়াশলাইয়ের কাঠি। ফুস কইরা একবার জ্বলল, তারপর শেষ। চমৎকার সব উপমা আমি ওর কাছে শুনেছি। যেমন মেয়েমানুষ সম্পর্কে তাঁর একটা ছড়া—

"মায়ে পুরা
ভইনে থুরা
কন্যায় পাই,
স্ত্রীর কপালে
কিছুই নাই।"

এই ছড়ার অর্থ জানি না। অসংখ্যবার তাঁর কাছে শুনেছি বলে এখনও মনে আছে।

উনু একবার আমাকে চিতইপিঠা খাওয়াবার দাওয়াত দিল। তার বাবা চিতইপিঠা বানাবেন। যথাসময়ে উপস্থিত হলাম। উঠোনে চুলায় পিঠা সেকা হচ্ছে। পিতা এবং পুত্র মিলে পিঠা বানাচ্ছে। গল্পগুজব করতে করতে পিঠা খাওয়া হচ্ছে। ওদের দুজনকে দেখে যা হিংসা লাগল! মনে হল ওরা কত সুখী। আমার যদি মা না থাকত কী চমৎকার হত!

উনুর কপালে সুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না। তার বাবা বিয়ে করে ফেললেন। উনু গম্ভীর হয়ে আমাকে বলল, সৎমার সংসারে থাকব না। দেশান্তর হব।

আমি বললাম, কোথায় যাবে?

এখনও ঠিক করি নাই। ত্রিপুরা, আসাম এক জায়গায় গেলেই হয়।

প্রাণের বন্ধুকে একা ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ঠিক করলাম আমিও সঙ্গে যাব। বন্ধুর শোকে আমার ভিতরেও খানিকটা বৈরাগ্য এসে গেছে।

এক সকালে সিলেট রেলস্টেশন থেকে ছাড়ছে এমন একটি ট্রেনের কামরায় দুজন উঠে বসলাম। ট্রেন কোথায় যাচ্ছে কিছুই জানি না। ট্রেন ছাড়ার পরপরই আমার মন থেকে দেশান্তরি হবার যাবতীয় আগ্রহ কর্পূরের মতো উবে গেল। বাসার জন্য খুব যে মন-খারাপ হল তা না। প্রচণ্ড ভয়ে অস্থির হলাম এই ভেবে যদি টিকিট চেকার ওঠে তখন কী হবে! কান্না শুরু করলাম। ট্রেনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্নার শব্দও বাড়তে লাগল। কেন জানি বাকি ঘটনা আমার পরিষ্কার মনে নেই। আবছা আবছা মনে আছে। পরের স্টেশনে আমাদের নামিয়ে দেয়া হল। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক বাসে করে আমাদের সিলেট

শহরে পৌঁছে দেন। আমার ভেতর থেকে দেশান্তরি হবার আগ্রহ পুরোপুরি চলে গেলেও উনুর ভেতর সেটা থেকেই যায়। প্রতি মাসে অন্তত একবার হলেও সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তিন-চারদিন কোথায় কোথায় কাটিয়ে আবার ফিরে আসে।

উনু শুধু যে আমার বন্ধু ছিল তা-ই না, শিক্ষকও ছিল। জগতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি। যেমন আকাশে প্লেন দেখলেই দৌড়ে গাছের নিচে কিংবা বাড়ির ভেতর ঢোকা উচিত। কারণ প্লেনের যাত্রীরা পেসাব-পায়খানা করলে তা মাথায় এসে পড়তে পারে।

নানান ওষুধপত্রের টোটকা দাওয়াইও তার জানা ছিল। যেমন মুখে ডিম নিয়ে যেসব লাল লাল পিঁপড়া হেঁটে যায় ঐসব পিঁপড়া দৈনিক পাঁচটা করে খেলে অর্শরোগ সেরে যায়।

যেহেতু আমার অর্শরোগ ছিল না কাজেই সেই মহৌষধ পরীক্ষা করে দেখা হয়ে ওঠেনি।

উনুকে আমি কখনো হাসিখুশি দেখিনি। সারাক্ষণ সে চিন্তিত ও বিষণ্ন। শুধু একদিন হাসতে হাসতে দৌড়ে তাকে আমাদের বাসার দিকে আসতে দেখা গেল। জানলাম তার একটা বোন হয়েছে। দেখতে সে নাকি পরীর মতো সুন্দর। জন্মের পরপর সে হাসতে শিখে গেছে। সারাক্ষণ নাকি হাসছে।

আমি পরদিন সদাহাস্যময়ী উনুর ভগিনীকে দেখতে গেলাম। উনুর মা শাড়ির আঁচল ফাঁক করে লাল টুকটুকে শিশুটিকে দেখিয়ে খুশি-খুশি গলায় বললেন, নজর লাগাইও না। মাটিতে থুক দেও। যাতে শিশুটির উপর নজর না লাগে সেজন্যেই আমি এবং উনু দুজনই মাটিতে একগাদা থুথু ফেললাম। এই ঘটনার খুব সম্ভব এক সপ্তাহের ভেতর উনুর বাবা সন্ন্যাসরোগে মারা গেলেন।

অন্যের দুঃখে অভিভূত হবার মতো বয়স বা মানসিকতা কোনোটাই তখন ছিল না। কাজেই এই ঘটনা আমার মনে কোনো ছাপ ফেলল না। আমাদের বাসায়ও তখন বড় ধরনের সমস্যা। গনি চাচার চাকরি চলে গেছে। অ্যান্টিকরাপশনের মামলা চলছে তাঁর বিরুদ্ধে। জেল হয়ে যাবে, মোটামুটি নিশ্চিত। তিনি কপর্দকশূন্য অবস্থায় তাঁর স্ত্রী এবং পালক-পুত্রকে নিয়ে আমাদের বাসায় এসে উঠেছেন। গনি চাচার স্ত্রী রাতদিন কাঁদেন। সেই কান্নাও ভয়াবহ কান্না। চিৎকার, মাটিতে গড়াগড়ি। আমরা ছোটরা অবাক হয়ে দেখি।

গনি চাচা উঠোনে পাটি পেতে সারাদিন শুয়ে থাকেন এবং তালপাতার পাখায় হাওয়া খান। দীর্ঘদিন তাঁরা আমাদের বাসায় রইলেন। দুটি সংসার

টানতে গিয়ে মা হিমশিম খেয়ে গেলেন। তাঁর অতি সামান্য যেসব সোনার গয়না ছিল সব বিক্রি হয়ে গেল। সেবার ঈদে আমরা কেউ কোনো কাপড় পেলাম না। আমাদের বলা হল, অল্পদিন পরেই বড় ঈদ আসছে। বড় ঈদে সবাই ডাবল ডাবল কাপড় পাব।

যেহেতু খানিকটা বড় হয়েছি চারপাশের জগৎ কিছুটা হলেও বুঝতে শিখেছি, সে- কারণে মনের কষ্ট পুরোপুরি দূর করতে পারছি না। মন-খারাপ করে ঘুরে বেড়াই। আশেপাশের বাচ্চারা বাবাদের হাত ধরে দোকানে যায়। কলরব করতে করতে ফিরে আসে।

মনের কষ্ট দূর করতে উনুর চেয়ে ভালো কেউ নেই। মুহূর্তের মধ্যে সে অন্যের মন-খারাপ ভাব দূর করে দিতে পারে যদিও সে নিজে আগের চেয়েও বিষণ্ন হয়ে যায়।

উনুকে বাসায় পেলাম না, উনুর মা'কেও না। তারা সবাই কোথায় নাকি চলে গেছে। খুব খারাপ লাগল। উনুদের পাশের বাসার এক ছেলে বলল, উনু জল্লারপাড়ের এক চায়ের দোকানে কাজ করে। বাবাবিহীন সংসারের দায়িত্ব এই বয়সেই সে মাথায় নিয়ে নিয়েছে।

খুঁজে খুঁজে একদিন তাকে বের করলাম। ময়লা হাফপ্যান্ট পরা। টেবিলে-টেবিলে চা দিচ্ছে। আমি বাইরে থেকে ডাকলাম—এই উনু! সে তাকাল কিন্তু দোকান থেকে বেরিয়ে এল না।

বাসায় ফিরে এলাম।

বাসায় খুব আনন্দ। খুব উত্তেজনা। বাবা জগদল থেকে আমাদের নিতে এসেছেন। এবং ঘোষণা করেছেন এই ঈদেই আমাদের সবাইকে কাপড় এবং জুতা দেয়া হবে। কেনাও হবে আজ।

আনন্দে লাফাতে লাগলাম।

উনুর কথা মনে রইল না।

## জগদলের দিন

আমার শৈশবের অদ্ভুত স্বপ্নময় কিছুদিন কেটেছে জগদলে। জগদলের দিন আনন্দময় হবার অনেকগুলি কারণের প্রধান কারণ স্কুলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। সেখানে কোনো স্কুল নেই। কাজেই পড়াশোনার যন্ত্রণা নেই। মুক্তির মহানন্দ।

আমরা থাকি এক মহারাজার বসতবাড়িতে, যে-বাড়ির মালিক অল্প কিছুদিন আগেই দেশ ছেড়ে ইন্ডিয়াতে চলে গেছেন। বাড়ি চলে এসেছে পাকিস্তান

সরকারের হাতে। মহারাজার বিশাল এবং প্রাচীন বাড়ির একতলায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা। দুতলাটা তালাবন্ধ। শুধু দুতলা নয়, কয়েকটা ঘর ছাড়া বাকি সবটা তালাবন্ধ। কারণ মহারাজা জিনিসপত্র কিছুই নিয়ে যাননি। ঐসব ঘরে তাঁর জিনিসপত্র রাখা।

ঐ মহারাজার নাম আমার জানা নেই। যাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনিও বলতে পারলেন না। তবে তিনি যে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন তার অসংখ্য প্রমাণ এই বাড়িতে ছড়ানো। জঙ্গলের ভেতর বাড়ি। সেই বাড়িতে ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করার জন্য তাঁর ছিল নিজস্ব জেনারেটর। দাওয়াতের চিঠি ছেপে পাঠানোর জন্যে মিনি সাইজের একটা ছাপাখানা।

বাবাকে অসংখ্যবার বলতে শুনেছি—মহারাজার রুচি দেখে মুগ্ধ হতে হয়। আহা, কত বই! কত বিচিত্র ধরনের বই।

বাবা অনেক লেখালেখি করলেন, যাতে বইগুলি অন্তত সরকারি পর্যায়ে সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়। তাঁর লেখালেখিতে কোনো কাজ হল না। বাবা কতবার যে গভীর বেদনায় বললেন—আহা, চোখের সামনে বইগুলো নষ্ট হচ্ছে, কিছু করতে পারছি না! তিনি ইচ্ছা করলেই সমস্ত বই নিজের সংগ্রহে যুক্ত করতে পারতেন। তাতে বইগুলি রক্ষা পেত। তিনি তা করলেন না। পরের জিনিস নিজের মনে করার প্রশ্নই আসে না। তিনি হাহুতাশ করতে লাগলেন। চোখের সামনে বই নষ্ট হতে লাগল। হোক নষ্ট, তাতে আমাদের অর্থাৎ ছোটদের তেমন কিছুই যায় আসে না। কারণ আমাদের সামনে অন্য একটি জগৎ খুলে গেছে।

বাড়ির সামনে বিশাল বন। একটু দূরেই নদী, যে-নদীর পানি কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ। নদীর তীরে বালি ঝিকমিক করে জ্বলে। নদীটিই পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ার সীমানা। সারাক্ষণ অপেক্ষা করতাম কখন দুপুর হবে—নদীতে যাব গোসল করতে। একবার নদীতে নামলে ওঠার নাম নেই। তিন ভাইবোন নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি করছি, বড়রা হয়তো একজনকে জোর করে ধরে পাড়ে নিয়ে রাখল। আনতে গেল অন্যজনকে। এই ফাঁকে পাড়ে যে আছে সে লাফিয়ে নামল।

বিকেলগুলিও কম রোমাঞ্চকর ছিল না। প্রতিদিনই বাবা কাঁধে গুলিভরা বন্দুক নিয়ে বলতেন—চল বনে বেড়াতে যাই। কাঁধে বন্দুক নেয়ার কারণ হচ্ছে প্রায়ই বাঘ বের হয়। বিশেষ করে চিতাবাঘ।

বাবার সঙ্গে সন্ধ্যা পর্যন্ত বনে ঘুরতাম। ক্লান্ত হয়ে ফিরতাম রাতে। ভাত খাওয়ার আগেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসত। কত বিচিত্র শব্দ আসত বন থেকে। আনন্দে এবং আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠতাম।

সবাই ঘুমুতাম একটা ঘরে। বিশাল তিনটা খাট একত্র করে ফুটবলের মাঠের আকৃতির একটা বিছানা তৈরি করা হত। বিছানার উপরে সেই মাপে তৈরি এক মশারি। রাতে বাথরুম পেলে মশারির ভেতর থেকে নামা নিষিদ্ধ ছিল কারণ খুব কাঁকড়াবিছা এবং সাপের উপদ্রপ।

কাঁকড়াবিছাগুলি সাপের মতোই মারাত্মক। একবার কামড়ালে বাঁচার আশা নেই, এমনি তার বিষ। মৃত্যু সঙ্গে নিয়ে কাঁকড়াবিছা মেঝেতে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, আমি বিছানায় বসে মুগ্ধ হয়ে দেখছি—এই ছবি এখনও চোখে ভাসে।

আমাদের আশেপাশে কোনো জনমানব ছিল না। অনেক দূরে বনের ভেতর একজন কম্পাউন্ডার থাকতেন। সভ্য মানুষ বলতে তিনিই। তাঁর বড় মেয়েটির নাম আরতি। আমার বয়সী, বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে। দেবী প্রতিমার মতো শান্ত মুখশ্রী, কিন্তু সেই শ্রীময়ী চেহারার সঙ্গে স্বভাবের কোনো মিল নেই। একদিন সকালে আমাদের বাসার সামনে এস মিহি সুরে ডাকতে লাগল—কাজল, এই কাজল!

আমি বের হয়ে এলাম। যেন কত দীর্ঘদিনের চেনা সেই ভঙ্গিতে বলল, বনে বেড়াতে যাবে? উচ্চরণ বিশুদ্ধ শান্তিপুরী। গলার স্বরটিও ভারি মিষ্টি। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, হ্যাঁ।

সে আমাকে নিয়ে বনে ঢুকে গেল। ক্রমেই সে ভেতরের দিকে যাচ্ছে। আমি একসময় শঙ্কিত হয়ে বললাম, ফেরার পথ মনে আছে? সে আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসল যে এরকম অদ্ভুত কথা কখনো শোনেনি। তার পরই হঠাৎ একটা দৌড় দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

আমি ভাবলাম, নিশ্চয় লুকোচুরি জাতীয় কোনো খেলা। আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা। আমি খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে করতে কাতর গলায় ডাকতে লাগলাম—আরতি, এই আরতি!

তার কোনো খোঁজ নেই। এই অদ্ভুত মেয়ে আমাকে বনে রেখে বাসায় চলে গেছে।

আমি পথ খুঁজে বের করতে গিয়ে আরও গভীর বনে ঢুকে পড়লাম। একসময় দিশাহারা হয়ে কাঁদতে বসলাম। জনৈক কাঠকুড়ানো সাঁওতাল যুবক এই অবস্থায় আমাকে উদ্ধার করে বাসায় দিয়ে আসে।

এর দিন পাঁচেক পর আরতি আবার এসে ডাকতে লাগল—এই কাজল, এই— আমি বের হওয়ামাত্র বলল, বনে যাবে?

আমি খুব ভালো করে জানি, এই মেয়ে আমাকে আবার আগের দিনের মতো গভীর জঙ্গলে ফেলে দিয়ে চলে আসবে। তবু তার আহ্বান উপেক্ষা করতে

পারলাম না। পরে যা হবার হবে। আপাতত খানিকক্ষণ এই রূপবতী পাগলি মেয়ের সঙ্গে থাকা যাক। সেদিনও সে তা-ই করল। এর জন্যে তার উপর আমার কোনোরকম রাগ হল না। বরং মনে হল এই মেয়েটির পাশাপাশি থাকার বিনিময়ে আমি আমার সমস্ত পৃথিবী দিয়ে দিতে পারি। এই মোহকে কী বলা যায়? প্রেম? প্রেম সম্পর্কে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা তো এখানে খাটে না। তা হলে এই প্রচণ্ড মোহের জন্ম কোথায়? আমি জানি না। শুধু জানি, মেয়েটির বাবা একদিন তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে ইন্ডিয়া চলে যান। এই খবর পেয়ে গভীর শোকে আমি হাউমাউ করে কাঁদতে থাকি। মা যখন জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? আমি বললাম, পেটে ব্যথা। বলে আরও উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলাম। পেটব্যথার অষুধ হিসেবে পেটের নিচে বালিশ দিয়ে আমাকে সারাদিন উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হল। বাবা আমাকে দুফোঁটা বায়োকেমিক অষুধ দিলেন। তখন তিনি বায়োকেমিক অষুধ নিয়ে খুব মেতেছেন। চমৎকার একটা ব্যাগে তাঁর অষুধ থাকে। বারোটা শিশির বারো রকমের অষুধ। পৃথিবীর সব রোগব্যাধি এই শিশির ঔষধে আরোগ্য হয়। অনেকটা হোমিওপ্যাথির মতো। তবে হোমিওপ্যাথিতে যেমন অষুধের সংখ্যা অনেক, এখানে মাত্র বারোটা।

বাবার বায়োকেমিক চিকিৎসায় আমার বিরহব্যথা অনেকটা দূর হল। এই পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নয়—এমন মনোভাব নিয়ে বিছানা থেকে নামলাম। কিছুক্ষণের ভেতরই আবার বিছানায় উঠতে হল। কারণ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। বাবা-মা দুজনেরই মুখ শুকিয়ে গেল—লক্ষণ ভালো নয়। নিশ্চয় ম্যালেরিয়া। সেই সময়ে এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া কুখ্যাত ছিল। একবার কাউকে ধরলে তার জীবনীশক্তি পুরোপুরি নিঃশেষ করে দিত। ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমরা প্রতিষেধক হিসেবে বায়োকেমিক ওষুধ ছাড়াও প্রতি রবিবারে পাঁচ গ্রেন করে কুইনাইন খাচ্ছি। তার পরও ম্যালেরিয়া ধরবে কেন?

বাবা এই ভয়ংকর জায়গা থেকে বদলির জন্য চেষ্টা-তদবির করতে লাগলেন। শুনে আমার মন ভেঙে গেল। এত সুন্দর জায়গা, এমন চমৎকার জীবন—এসব ছেড়ে কোথায় যাব? ম্যালেরিয়ায় মরতে হলেও এখানেই মরব। তা ছাড়া ম্যালেরিয়া অসুখটা আমার বেশ পছন্দ হল। যখন জ্বর আসে তখন কী প্রচণ্ড শীতই-না লাগে! শীতের জন্যেই বোধহয় শরীরে একধরনের আবেশ সৃষ্টি হয়। জ্বর যখন বাড়তে থাকে তখন চোখের সামনের প্রতিটি জিনিস আকৃতিতে ছোট হতে থাকে। দেখতে বড় অদ্ভুত লাগে। একসময় নিজেকে বিশাল দৈত্যের মতো মনে হয়। কী আশ্চর্য অনুভূতি!

শুধু আমি একা নই, পালা করে আমরা সব ভাইবোন জ্বরে পড়তে লাগলাম।

একজন জ্বর থেকে উঠতেই অন্যজন জ্বরে পড়ে। জ্বর আসেও খুব নিয়মিত। আমরা সবাই জানি কখন জ্বর আসবে। সেই সময়ে লেপ-কাঁথা গায়ে দিয়ে আগেভাগেই বিছানায় শুয়ে পড়ি।

প্রতিদিন ভোরে তিন ভাইবোন রাজবাড়ির মন্দিরের চাতালে বসে রোদ গায়ে মাখি। এই সময় আমাদের সঙ্গ দেয় বেঙ্গল টাইগার। বেঙ্গল টাইগার হচ্ছে আমাদের কুকুরের নাম। না, আমাদের কুকুর নয়, মহারাজার কুকুর। তাঁর অনেক অনেকগুলি কুকুর ছিল। তিনি সবক'টাকে নিয়ে যান, কিন্তু এই কুকুরটিকে নিতে পারেননি। সে কিছুতেই রাজবাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি।

মা তাকে দুবেলা খাবার দেন। মাটিতে খাবার ঢেলে দিলে সে খায় না; থালায় করে দিতে হয়। শুধু তা-ই না, খাবার দেবার পর তাকে মুখে বলতে হয়—খাও।

খানদানি কুকুর। আদব-কায়দা খুব ভালো। তবে বয়সের ভারে সে কাবু। সারাদিন বাড়ির সামনে শুয়ে থাকে। হাই তোলে, ঝিমুতে ঝিমুতে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে।

এক ভোরবেলার কথা। আমার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। আমি কম্বল গায়ে দিয়ে মন্দিরের চাতালে বসে আছি। আমার সঙ্গে শেফু এবং ইকবাল। মা এসে আমাদের মাঝখানে শাহীনকে [আমার ছোট ভাই] বসিয়ে দিয়ে গেলেন। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তার দিকে নজর রাখা, সে যেন হামাগুড়ি দিয়ে চাতাল থেকে পড়ে না যায়।

মা চলে যাবার পরপরই হিসহিস শব্দে পেছনে ফিরে তাকালাম। যে-দৃশ্য দেখলাম সে-দৃশ্য দেখার জন্য মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না। মন্দিরের বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে প্রকাণ্ড একট কেউটে সাপ বের হয়ে আসছে। মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসে। ফণা তুলে এদিক-ওদিক দেখছে, আবার মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে, আবার ফণা তোলে। আমরা তিন ভাইবোন ছিটকে সরে গেলাম। শাহীন একা বসে রইল, সাপ দেখে তার আনন্দের সীমা নেই। সে চেষ্টা করছে সাপটির দিকে এগিয়ে যেতে। আর তখনই বেঙ্গল টাইগার ঝাঁপিয়ে পড়ল সাপটির উপর। ঘটনা এত দ্রুত ঘটল যে আমরা কয়েক মুহূর্ত বুঝতেই পারলাম না কী হচ্ছে। একসময় শুধু দেখলাম কুকুরটা সাপের ফণা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। বেঙ্গল টাইগার ফিরে যাচ্ছে নিজের জায়গার। যেন কিছুই হয়নি। নিজের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড সে শেষ করল।

সাপ কুকুরটিকে কামড়াবার সুযোগ পেয়েছিল কি না জানি না। সম্ভবত কামড়ায়নি। কারণ কুকুরটি বেঁচে রইল, তবে নড়াচড়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিল।

দ্বিতীয় দিনে তার চামড়া খসে পড়ল এবং দগদগে ঘা দেখা দিল। এই থেকে মনে হয় সাপ সম্ভবত কামড়েছে। সাপের বিষ কুকুরের ক্ষেত্রে হয়তো তেমন ভয়াবহ নয়।

আরও দুদিন কাটল। কুকুরটি চোখের সামনে পচেগলে যাচ্ছে। তার কাতরধ্বনি সহ্য করা মুশকিল। গা থেকে গলিত মাংসের দুর্গন্ধ আসছে।

বাবা মাকে ডেকে বললেন, আমি এর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। তুমি বন্দুক বের করে আমাকে দাও।

বাবা আমাদের চোখের সামনে পরপর দুটি গুলি করে কুকুরটিকে মারলেন। শান্ত গলায় বললেন, যে আমার ছেলের জীবন রক্ষা করেছে তাকে আমি গুলি করে মারলাম। একে বলে নিয়তি।

আমার কাছে বাবাকে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম মানুষদের একজন বলে মনে হল। নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম না এমন একটি কাজ তিনি কী করে করতে পারলেন। রাগে দুঃখে ও অভিমানে রাতে ভাত না খেয়ে শুয়ে পড়েছি। বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে বারান্দায় বসালেন।

দুজন চুপচাপ বসে আছি। চারদিকে ঘন অন্ধকার। তক্ষক ডাকছে। বাড়ির চারপাশের আমের বনে হাওয়া লেগে বিচিত্র শব্দ উঠছে।

বাবা কিছুই বললেন না। হয়তো অনেক কিছুই তাঁর মনে ছিল। মনের ভাব প্রকাশ করতে পারলেন না। একসময় বললেন, যাও ঘুমিয়ে পড়ো।

কুকুরটি আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল।

আমার মনে আছে—এই নিয়ে আমি কিছু-একটা লিখতে চেষ্টাও করেছিলাম। রচনাটির নাম দিয়েছিলাম বেঙ্গল টাইগার কিংবা আমাদের বেঙ্গল টাইগার। সম্ভবত এই রচনাই আমার প্রথম সাহিত্য। বলাই বাহুল্য, অতি তুচ্ছ রচনা। কিন্তু হৃদয়ের গভীর যাতনায় যার জন্ম তাকে তুচ্ছই-বা করি কী করে?

জগদলে বেশিদিন থাকা হল না। বাবা বদলি হলেন দিনাজপুরের পচাগড়ে [পঞ্চগড়]। এই জায়গা সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে ভোরবেলা বাসার সামনে এসে দাঁড়ালে কাঞ্চনজঙ্ঘার ধবল চূড়া দেখা যেত। মনে হত পাহাড়টা রূপার পাতে মোড়া। সূর্যের আলো পড়ে সেই রূপা চকচক করছে। বাবা আমাদের মধ্যে সাহিত্যবোধ জাগ্রত করবার জন্যেই হয়তো এক ভোরবেলায় ঘোষণা করলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নিয়ে যে একটা কবিতা লিখতে পারবে সে চার আনা পয়সা পাবে। অনেক চেষ্টা করেও কোনো কবিতা দাঁড় করাতে পারলাম না। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আরও মন-খারাপ হল যখন আমাদের তিন ভাইবোনকে স্কুলে ভরতি করিয়ে দেয়া হল।

স্কুলে ভরতি করতে নিয়ে গেলেন বড়মামা। তিনজনই কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছি। এই পৃথিবীর হৃদয়হীনতা কেউই সহ্য করতে পারছি না। বড়মামা উপদেশ দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছেন—"বিদ্যা অমূল্য ধন", "পড়াশোনা করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে"—এইসব।

অমূল্য ধন বা গাড়ি-ঘোড়া কোনোকিছুরই প্রতি আকর্ষণ বোধ করছি না।

বড়মামা আমাদের চোখের জল অগ্রাহ্য করে স্কুলে ভরতি করিয়ে দিলেন। শুধু তা-ই নয়, হেডমাস্টার সাহেবকে বললেন, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে আমি বিনা বেতনে আপনাদের স্কুলে পড়াব। আপাতত আমার কিছু করার নেই। হাতে প্রচুর অবসর।

হেডমাস্টার রাজি হলেন। আমি খানিকটা আশার আলো দেখতে পেলাম। যা-ই হোক, একজন স্যার হলেন আমাদের নিজেদের লোক এবং অতি প্রিয় মানুষ। স্কুলের দিনগুলি হয়তো খারাপ যাবে না। দ্বিতীয় দিনেই বড়মামা আমাদের ক্লাসে অঙ্ক করাতে এলেন। আমি হাসিমুখে চেঁচিয়ে উঠলাম—"বড়মামা।"

মামার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। হুংকার দিয়ে বললেন—মামা? মামা মানে? চড় দিয়ে সব দাঁত খুলে ফেলব। স্কুলে আমি তোমাকে চিনি না। তুমিও আমাকে চেন না। বলো, ৬-এর ঘরের নামতা বলো। পাঁচ ছয় কত?

আমি হতভম্ব।

একি বিপদ! ছয়ের ঘরের নামতা যে জানি না এটা বড়মামা খুব ভালো করেই জানেন। কারণ তিনি আমাদের পড়ান।

তিনি দুনিয়া-কাঁপানো হুংকার দিলেন, কী, পারবে না?

না।

না আবার কী? বলো, জি না।

জি না।

বলো, জি না স্যার।

জি না স্যার।

না পারার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা হবে। আত্মীয় বলে আমার কাছ থেকে পার পাওয়া যাবে না। আমার চোখে সব সমান। সবাই ছাত্র। ক্লাস-ক্যাপ্টেন কোথায়? যাও, বেত নিয়ে আসো।

বেত আনা হল। এবং সত্যি সত্যি বড়মামা ছয়টি বেতের বাড়ি দিলেন—যেহেতু ছয়ের ঘরের নামতা।

স্কুলে মোটামুটি আতঙ্কের সৃষ্টি হয়ে গেল। ছাত্রমহলে রটে গেল ভয়ংকর

রাগী একজন স্যার এসেছেন। অতি কড়া, তার ক্লাসে নিশ্বাস ফেলা যায় না।

বড়মামার চাকরি দীর্ঘস্থায়ী হল না। স্থানীয় এস.ডি.ও. সাহেবের ছোট ভাইকে কানে ধরে উঠবস করাবার কারণে তাঁর চাকরি চলে গেল। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বড়মামা আবার আগের মূর্তিতে ফিরে এসেছেন। গল্প করছেন, আমাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথায় গেলে নাকি রাতের বেলা দার্জিলিং শহরের বাতি দেখা যায়, নিয়ে গেলেন।

গভীর রাত পর্যন্ত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছি। দার্জিলিং শহরের বাতি আর দেখছি না। উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল। কিছুই দেখা গেল না। বড়মামা বিরক্ত হয়ে বললেন, ওদের আজ বোধহয় ইলেকট্রিসিটি ফেল করেছে। আরেকদিন আসতে হবে। অসাধারণ দৃশ্য! না দেখলে জীবন বৃথা।

একদিন সাইকেলের সামনে বসিয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন পাহাড়ি নদী দেখাতে। প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে নালার মতো একটা জলধারা পাওয়া গেল। মামা বললেন, তুমি ঘুরে বেড়াও। আমি এই ফাঁকে একটা কবিতা লিখে ফেলি। মামা নদীর পাড়ে বসে রুলটানা খাতায় কবিতা লিখতে বসলেন। দীর্ঘ কবিতা লেখা হল। কবিতার নামটা মনে আছে।

"হে পাহাড়ী নদী"।

বড়মামার এই কবিতা স্থানীয় একটি পত্রিকায় ছাপাও হল। পচাগড়ের দিনগুলি আমাদের কাছে একসময় সহনীয় হয়ে উঠল এবং ভালো লাগতে লাগল। আমার একজন বন্ধু জুটে গেল যে নর্দমার পানিতে মাছ মারার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। দুজনেই বড়শি-হাতে নর্দমায় নর্দমায় ঘুরে বেড়াই। নর্দমায় ট্যাংরা, লাটি এবং পুঁটিমাছ পাওয়া যায়। আমার বন্ধুর পকেটে নারিকেলের মালায় থাকে কেঁচো। সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক টুকরা কেঁচো নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বড়শিতে গেঁথে পানিতে ফেলে দেয়। দেখতে বড় ভালো লাগে।

## শেষ পর্বে শঙ্খনদী

পচাগড় থেকে বাবা বদলি হলেন রাঙ্গামাটিতে।

দেশের এক মাথা থেকে আরেক মাথা। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশ। ভাগ্য ভালো হলে দেখা যাবে রাঙ্গামাটি খুব জঙ্গলি জায়গা—স্কুল নেই। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, স্কুল আছে নাকি?

তিনি বললেন, অবশ্যই আছে। স্কুল থাকবে না কেন? রাঙ্গামাটি বেশ বড়

শহর। খুব সুন্দর শহর!

স্কুল আছে শুনে একটু মনমরা হয়ে গেলাম। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছুই নেই। কাবাবে হাড্ডি থাকে, চাঁদে থাকে কলঙ্ক। স্কুলের যন্ত্রণা সহ্য করতেই হবে বলে মনে হচ্ছে।

চিটাগাং থেকে রাঙ্গামাটি যেতে হয় লক্কর-মার্কা বাসে। রাস্তা অসম্ভব খারাপ। পাহাড়ের গা-ঘেঁষে বাস যখন উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন বাসের হেল্পার চেঁচিয়ে বলে, আল্লাহর নাম নেন। ইসটার্ট বন্ধ হইতে পারে।

সত্যি সত্যি স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। ভবিষ্যদ্বাণী এমন ফলে গেছে দেখে কন্ডাকটারের মুখে বিমলানন্দের হাসি। ড্রাইভার বাস থেকে বের হয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিড়ি খাচ্ছে। তার নির্বিকার ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রায়ই ঘটে।

বাস কখন ছাড়বে জিজ্ঞেস করতেই সে সুফি–সাধকের মতো নির্লিপ্ত গলায় বলল, আল্লাহর হুকুম হইলেই ছাড়ব। আমরা বাসযাত্রীরা বাস থেকে নেমে আল্লাহর হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মা আমাদের সর্বকনিষ্ঠ বোনটির কান্না থামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ ভ্রমণে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ক্রমাগত কাঁদছে। বাবা আমাদের নিয়ে বের হয়েছেন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে এগুচ্ছি—এ কোথায় এসে পড়লাম? স্বপ্নপুরীর মতো সুন্দর দেশ। চারদিকে পাহাড়ের সারি ঢেউয়ের মতো দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। মাথার উপর ঘন নীল আকাশ। বাতাসে কেমন যেন বুনো বুনো গন্ধ। রাস্তার পাশ ঘেঁষে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। কী পরিষ্কার তার পানি! বাসযাত্রীরা আঁজলা ভরে সেই পানি খাচ্ছে।

কিছুদূর এগুতেই যে-দৃশ্য দেখলাম তা দেখার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। হাতির খেদা থেকে ধরে-আনা একপাল হাতি। প্রতিটি হাতির পা দড়ি এবং শিকল দিয়ে বাঁধা। রুগ্‌ণ ভয়ার্ত চেহারা। সব মিলিয়ে সাত থেকে আটটা হাতি। দুটি হাতির বাচ্চাও আছে। এরা বাঁধা নয়, ছোটাছুটি করছে। দেখতে অবিকল পুতুলের মতো। বাচ্চা দুটি দেখে মনে হল তারা সময়টা কাটাচ্ছে খুব আনন্দে।

খেদার মালিক এগিয়ে এলেন। বাবাকে বললেন—সর্বমোট একুশটা হাতি ধরা পড়েছে। দশটা বিক্রি হয়েছে, তিনটা মারা গেছে। এখানে যে-ক'টা আছে সে-ক'টাও মারা যাবে। কোনো হাতি কিছু খাচ্ছে না। খেদার মালিক বলল, হাতির বাচ্চা একটা নেবেন নাকি স্যার?

বাবা কিছু বলবার আগেই আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম, নেব নেব।

বাবার মুখ দেখে মনে হল প্রস্তাবটা তিনি একেবারে ফেলে দিচ্ছেন না।

বিবেচনাধীন আছে। তিনি নিচু গলায় বললেন, দাম কত?

দাম নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। বলতে গেলে বিনা দামে বিক্রি হবে। আপনি চান কি না বলেন। নিলে আমার উপকার হয়। বাচ্চা দুটা এখন সমস্যা। ডিসি সাহেব একটা নিবেন বলেছিলেন, এখন বলছেন—না।

হাতির বাচ্চা শেষ পর্যন্ত কেনা হল না। কারণ এরা এখনও দুগ্ধপোষ্য। প্রতিদিন আধমণ দুধ এদের খাওয়াতে হবে। আমরা মন-খারাপ করে বাসে ফিরে এলাম। বাবা বললেন, পাহাড়ি জায়গায় আছি—হাতির বাচ্চা জোগাড় করা কোনো সমস্যা হবে না। একটা হাতির বাচ্চা কেনা যেতে পারে। আগে একটু গুছিয়ে বসি। তোমাদের মন- খারাপ করার কোনো কারণ নাই। এই বলে তিনি নিজেই সবচে' বেশি মন-খারাপ করলেন। বাস ঠিকঠাক হতে অনেক সময় লাগল। আমরা রাঙ্গামাটি পৌঁছলাম দুপুর- রাতে। আমাদের বাসা মূল শহর থেকে অনেকখানি দূরে। একটা পাহাড়ের মাথা কেটে ছ'টা বাড়ি বানানো হয়েছে। ঐ ছ'টা বাড়ির একটা আমাদের। অতি নির্জন জায়গা। চারদিকে ঘন বন। অদ্ভুত সব আওয়াজ আসছে বন থেকে। মা ভীতগলায় বললেন, এ কোথায় এনে ফেললে? বাবার মুখও শুকিয়ে গেল। এরকম বিরানভূমিতে বাসা, তা বোধহয় তিনিও ভাবেননি।

বাসা আমাদের খুব পছন্দ হল। পাহাড়ের উপর বাসায় আমরা থাকব এরকম তো কখনো ভাবিনি। এরকম বাসায় থাকা মানে আকাশের কাছাকাছি থাকা। কী সৌভাগ্য আমাদের! তারপর যখন শুনলাম আশেপাশে কোনো স্কুল নেই, আমাদের স্কুলে যেতে হবে না, তখন মনে হল আনন্দে পাগল হয়ে যাব।

সারাদিন খেলা। নতুন একটা খেলা বের করেছি। পাখি-পাখি খেলা। দুহাত পাখির ডানার মতো উঁচু করে এক দৌড়ে পাহাড় থেকে নিচে নামা। একসময় আপনা-আপনি গতি বাড়তে থাকে—মনে হয় সত্যি উড়ে চলেছি—পাখি হয়ে গেছি।

সন্ধ্যার পর বই নিয়ে বসি। সেটাও একধরনের খেলা। পড়া-পড়া খেলা। কারণ পড়া দেখিয়ে দেবার কেউ নেই। শাসন করার কেউ নেই।

বাবা প্রায় সারা মাস ট্যুরে থাকেন। মা সবচে ছোট বোনটিকে নিয়ে ব্যস্ত। বড় মামাও সঙ্গে নেই। এই প্রথম উনি ঠিক করেছেন আমাদের সঙ্গে আসবেন না। বড় বোনের পরিবারের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জীবন নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। নিজের পায়ে দাঁড়াবেন।

ছোট ছোট এতগুলো বাচ্চা সামলিয়ে মা'কে একা সংসার দেখতে হয়। তার উপর ভৌতিক সমস্যা দেখা দিল। আমাদের রান্নাঘর অনেকখানি দূরে। মা রান্না

করার সময় প্রায়ই দেখতে পান—একটা ছায়ামূর্তি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে। তিনি আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়লেন। সন্ধ্যা মেলাবার পরই সবাইকে একটা ঘরে বন্ধ করে হারিকেন জ্বালিয়ে বসে থাকেন। ঘুমুতে পারেন না। ঐ ছায়ামূর্তিকে অনেক দেখার চেষ্টা করলাম, সে দেখা দিল না। মা ছাড়া তাকে আর কেউ দেখে না। তবে এক সন্ধ্যায় তার খড়মের খটখট শুনলাম। কে যেন খড়ম পায়ে বারান্দায় হাঁটছে। মা ভয়ে সাদা হয়ে গেলেন। উঁচু গলায় আয়াতুল কুরসি পড়তে লাগলেন। সারারাত ঘুমুলেন না, আমাদেরও ঘুমুতে দিলেন না। পরদিন একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটল। বড়মামা এসে উপস্থিত। তিনি খুব সিরিয়াস গলায় বললেন, বুবু ভাববেন না যে আপনাদের সঙ্গে থাকব। দুদিনের জন্যে এসেছি। আমাকে রাখার জন্য শত অনুরোধ করলেও লাভ হবে না। আমার নিজের একটা জীবন আছে। আপনার ফ্যামিলির সঙ্গে ঘোরাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

মা বললেন, ঠিক আছে, দুদিন পরে চলে যাস।

আগেভাগে বলে রাখছি যাতে পরে যন্ত্রণা না করেন।

যন্ত্রণা করব না।

দুদিন থাকব। মাত্র দুদিন। দুই দিন এবং দুই রাত।

আচ্ছা ঠিক আছে।

মামার সেই দুদিন পরবর্তী আট বছরেও শেষ হল না। তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরতে লাগলেন।

রাঙ্গামাটি এসে তিনি সংগীতের দিকে মন দিলেন। জারিগান। নিজেই গান লেখেন—সুর দেন। জারিগান একা একা হয় না। তাল দিতে হয়। তাল দেবার জন্যে একদল শিশু জুটে গেল। মামা মাথায় গামছা বেঁধে একটা লাইন বলেন, আমরা হাততালি দিতে দিতে বলি—আহা বেশ বেশ বেশ।

শুধু বেশ বেশ বললে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে মাথাও নাড়তে হয়। মাথা নাড়া এবং হাততালির মধ্যে একধরনের সমন্বয় থাকতে হয়। ভুল করলে বড়মামা রাগ করেন।

রাতের বেলা গল্পের আসর। লেপের নিচে বসে তুলারাশি রাজকন্যার গল্প শোনার আনন্দের সঙ্গে কোনো আনন্দেরই তুলনা হয় না।

এক রাতে এরকম গল্প শুনছি। হঠাৎ শুনি মটমট শব্দ। তারপর মনে হল চারদিক যেন আলো হয়ে উঠেছে। 'আগুন আগুন' বলে চিৎকার উঠল। আমাদের ঠিক সামনের বাসায় আগুন ধরে গেছে। বাড়ি কাঠের। টিনের ছাদ। পুরো বাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছে। পাহাড়ের উপর পানির কোনো ব্যবস্থা নেই।

আগুনে বাড়ি পুড়ে ছাই হবে—কিছুই করা যাবে না। অবস্থা এমন যে আশেপাশের সবগুলি বাড়িতেই আগুন ছড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা। বড়মামা আমাদের কোলে করে আগুন থেকে যতটা সম্ভব দূরে রেখে আসলেন। আমাদের মাথার উপর ভেজা কম্বল—কারণ আগুনের ফুলকি উড়ে উড়ে আসছে। চোখ বড় বড় করে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দেখলাম। ভয়ংকরেরও একধরনের সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্য থেকেও চোখ ফেরানো যায় না। একসময় অবাক হয়ে দেখি.. জ্বলন্ত বাড়ির টিনের চালগুলি আকাশে উড়তে শুরু করেছে। প্লেনের মত ভোঁভোঁ শব্দ করতে করতে একেকটা টিন একেক দিকে উড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বাড়িতে আগুন লেগে গেল, সেখান থেকে তৃতীয় বাড়ি। চারদিকে আগুন নিয়ে ভেজা কম্বল মাথায় দিয়ে আমরা বসে আছি। মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে আগুন আমাদের গ্রাস করবে।

আমাদের এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। কী ভয়াবহ অভিজ্ঞতা!

রাঙ্গামাটিতে আমরা ছিলাম পাঁচ মাসের মতো। অগ্নিপর্বের কিছুদিন পরই বাবা আবার বদলি হলেন বান্দরবনে। দোহাজারী পর্যন্ত ট্রেনে। সেখান থেকে নৌকায়। সারারাত নৌকা চলল শঙ্খনদীতে। ভোরবেলা এসে পৌঁছলাম বান্দরবন। ঘন অরণ্যঘেরা ছোট্ট শহরতলি। অল্পকিছু বাড়িঘর। ইট-বিছানো ছোট্ট একটা রাস্তা। রাস্তার দুপাশে কয়েকটি দোকানপাট।

গ্রামে যেমন সাপ্তাহিক হাট বসে এখানেও তা-ই। বুধবারের সাপ্তাহিক হাট। পাহাড়ি লোকজন বুধবারে এসে উপস্থিত হয়। কত বিচিত্র জিনিসই তারা বিক্রি করতে আনে! বাঁদরের মাংস, সাপের মাংস। মুরং মেয়েরাও আসে। তাদের কোমরে এক চিলতে কাপড় ছাড়া সারা গা উদোম। কী বিচিত্র জায়গা! বান্দরবন অনেকটা উপত্যকার মতো। চারপাশেই পাহাড়। এইসব পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়ে ঝুম চাষ হয়। প্রতি সন্ধ্যায় একটা-না-একটা পাহাড় জ্বলতে থাকে।

বান্দরবনের বাসায় প্রথম দিনেই এক কাণ্ড হল। রাত ন'টার মতো বাজে। বাইরে "হুম হাম হিউ"—বিকট শব্দ। একসঙ্গে সবাই জানালার কাছে ছুটে এলাম। কী সর্বনাশ! একটা রাক্ষস দাঁড়িয়ে আছে। রাক্ষসের হাতে কেরোসিনের কুপি। সে কেরোসিনের কুপিতে ফুঁ দিতেই তার মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বের হল। আমরা সবাই ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। আমার মা পর্যন্ত ভয় পেয়ে বললেন—"এইটা কী?"

রাক্ষস তখন মানুষের মতো গলায় বলল, ভয় পাবেন না। ছোট

খোকাখুকিরা ভয় পাবেন না। আমি বহুরূপী। ভয় পাবেন না।

বান্দরবনেই আমার প্রথম এবং শেষ বহুরূপী দেখা। এই জিনিস আর কোথাও দেখিনি। সে প্রতিমাসে দুতিন বার সাজ-পোশাক পরে বের হত। কোনো রাতে সাজত ভালুক, কোনো রাতে জলদস্যু। ভোরবেলা দীনহীন মুখে বাসায় এসে বলত, খোকাখুকিরা আম্মাকে বলেন, আমি বহুরূপী। কিছু সাহায্য দিতে বলেন।

তখন আমার খুব কষ্ট লাগত। মনে হত সমস্ত পৃথিবীর রহস্য যার হাতের মুঠোয়—সে কিনা দিনে এসে মলিনমুখে ভিক্ষা করে! এত অবিচার কেন এই পৃথিবীতে?

এরকম বুনো এবং জংলা জায়গায়ও রাজপ্রাসাদ আছে। মুরং রাজার বাড়ি। দূর থেকে দেখি। কাছে যেতে ভয়-ভয় লাগে। মুরংরা রাজাকে দেখে দেবতার মতো। রাজবাড়ির দিকে চোখ তুলে তাকায় না—এতে নাকি পাপ হয়।

বান্দরবনের সবই ভালো—শুধু মন্দ দিকটা হল—এখানে একটা স্কুল আছে।

আমাদের স্কুলে ভরতি করিয়ে দেয়া হল।

মন পুরোপুরি ভেঙে গেল। স্কুলে আমার একমাত্র আনন্দের ব্যাপার হল মুরং রাজার এক মেয়ে পড়ে আমাদের সঙ্গে। গায়ের রং শঙ্খের মতো সাদা। চুল হাঁটু ছাড়িয়েও অনেকদূর নেমে গেছে। আমরা ক্লাস সিক্সে পড়ি, কিন্তু তাকে দেখায় একজন তরুণীর মতো। তার চোখ দুটি ছোট ছোট, গালের হনু খানিকটা উঁচু। আমার মনে হল চোখ দুটি আরেকটু বড় হলে তাকে মানাত না। গালের হনু উঁচু হওয়ায় যেন তার রূপ আরও খুলেছে।

ক্লাসে আমি স্যারদের দিকেও তাকাই না। বোর্ডে কি লেখা হচ্ছে তাও পড়তে চেষ্টা করি না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি রাজকন্যার দিকে। সত্যিকার রাজকন্যা।

আমার এই অস্বাভাবিক আচরণ রাজকন্যার চোখে পড়ল কী না জানি না, তবে একজন স্যারের চোখে পড়ল। তিনি আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। প্রতিটি ক্লাসেই তিনি আমাকে প্রশ্নে-প্রশ্নে জর্জরিত করেন, কিন্তু আমাকে আটকাতে পারেন ন। কারণ ইতিমধ্যে আমি একটা জিনিস বুঝে ফেলেছি—আমার স্মৃতিশক্তি অসম্ভব ভালো। যে-কোনো পড়া একবার পড়লেই মনে থাকে। সব পড়াই একবার অন্তত পড়ে আসি। স্যার আমাকে কিছুতেই কায়দা করতে পারেন না। বারবার জাল কেটে বের হয়ে আসি।

কোনো অধ্যবসায়ই বৃথা যায় না। স্যারের অধ্যবসায়ও বৃথা গেল না, আমাকে আটকে ফেললেন। সমকোণ কাকে বলে জিজ্ঞেস করলেন, আমি বলতে পারলাম না।

রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে-ও পারল না। না পারারই কথা। রাজকন্যারা সবসময়েই খানিকটা হাবা ধরনের হয়। স্যার রাজকন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন— পড়া পারনি কেন?

রাজকন্যা জবাব দিল না। তার ছোট ছোট চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। সেই অশ্রুবর্ষণ-দৃশ্যে যে-কোনো পাষাণ দ্রবীভূত হবে। স্যার দ্রবীভূত হলেন। রাজকন্যাকে বসতে বললেন। আমার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা হল। বিচিত্র শাস্তি। বড় একটা কাগজে লেখা হল—

"আমি পড়া পারি নাই।
আমি গাধা।"

সেই কাগজ গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হল। স্যার একজন দপ্তরিকে ডেকে আনলেন এবং কঠিন গলায় বললেন, এই ছেলেকে সবক'টা ক্লাসে নিয়ে যাও। ছাত্ররা দেখুক।

আমি অপমানে নীল হয়ে গেলাম। টান দিয়ে গলার কাগজ ছিঁড়ে স্যারের দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বললাম, আপনি গাধা। তারপর এক দৌড় দিয়ে স্কুল থেকে বের হয়ে গেলাম। বাসায় ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আমি শঙ্খনদীর তীর ঘেঁষে দৌড়াচ্ছি। আমাকে যেতে হবে অনেক অনেক দূরে। লোকালয়ে আমার থাকা চলবে না। কেউ যেন কোনোদিন আমাকে আর না দেখে।

সন্ধ্যাবেলা লোক পাঠিয়ে শঙ্খনদীর তীর থেকে বাবা আমাকে ধরিয়ে আনলেন। আমি আতঙ্কে কাঁপছি। নাজানি কী শাস্তি অপেক্ষা করছে আমার জন্যে!

বাবা শান্ত গলায় বললেন, তুমি তোমার স্যারকে যা বলেছ তার জন্যে কি তুমি লজ্জিত?

আমি বললাম,—না।

বাবা দ্বিতীয়বার বললেন, তুমি আবার ভেবেচিন্তে বলো, তুমি কি লজ্জিত?

না।

লজ্জিত হওয়া উচিত। স্যারেরা তোমাকে পড়ান। তোমাদের শাস্তি দেয়ার অধিকার তাঁদের আছে। তুমি আমার সঙ্গে চলো। স্যারের কাছে ক্ষমা চাইবে।

আমি বাবার সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে রওনা হলাম। স্যারের কাছে ক্ষমা চাইলাম। আমার ক্ষমা প্রার্থনার পর বাবা বললেন, মাস্টারসাহেব, আমার এই

ছেলেটা খুব অভিমানী। সে বড় ধরনের কষ্ট পেয়েছে। অপমানিত বোধ করেছে। তাকে আমি কোনোদিন এই স্কুলে পাঠাব না। সে বাসায় থাকবে।

কী বলছেন আপনি!

আমার ছেলের অপমান আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার। বাবা আমাকে কোলে নিয়ে বাসায় ফিরলেন। পরদিন হেডমাস্টার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের সব শিক্ষক বাসায় উপস্থিত। তাঁরা বাবাকে রাজি করাতে এসেছেন যাতে আমি আবার স্কুলে যাই। বাবা রাজি হলেন না। তাঁর এক কথা, আমি তাকে স্কুলে পাঠাব না।

সারাদিন একা একা বাসায় থাকি। কিছুতেই সময় কাটে না। ছোট দুই ভাইবোন স্কুলে। মা ব্যস্ত। আমার কিছু করার নেই। আমি স্কুলের সময়টা শঙ্খনদীর তীর ঘেঁষে হেঁটে হেঁটে কাটাই।

বাবা মাঝে মাঝে আমাকে ট্যুরে নিয়ে যান। কখনো রামু, কখনো থানচি, কখনো নাইক্ষ্যংছড়ি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরার পেছনে বাবার যে-উদ্দেশ্য কাজ করছিল তা হল প্রকৃতির রূপের দিকে আমার চোখ ফেরানো। তিনি আমাকে মোটা একটা খাতা এবং কলম দিলেন যাতে আমি কী কী দেখছি তা গুছিয়ে লিখি। একদিন খাতা দেখতে চাইলেন।

যা যা লেখা হয়েছে তা পড়ে বড়ই বিরক্ত হলেন। প্রকৃতি সম্পর্কে খাতায় কিছুই লেখা নেই। যা লেখা তা পড়ে বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে।

মঙ্গলবার

আজ আমরা রামু থানায় পৌছিয়াছি।

দুপুরে ভাত খাইয়াছি। মুরগির গোশত এবং আলু।

ডাল ছিল। ডাল খাই নাই।

বাবা বললেন, তুই কী দিয়ে ভাত খেলি তা বিতং করে লেখার কী দরকার? অন্যরা এই খবর জেনে কী করবে?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, অন্যদের জন্যে তো আমি লিখি নাই। আমি লিখেছি আমার জন্য।

কোনদিন কী খেয়েছিস তার খোঁজেই-বা তোর কী দরকার? এই যে এত সুন্দর জলপ্রপাত তোকে দেখিয়ে আনলাম সেই প্রপাতটার কথা লিখলি না কেন?

জলপ্রপাতের কথা লিখলে কী হবে?

যারা জলপ্রপাতটা দেখেনি তারা তোর লেখা পড়ে বুঝবে জিনিসটা কেমন। যা, লিখে নিয়ে আয়। দেখি পারিস কি না।

সেই জলপ্রপাত আমাকে মোটেই আকর্ষণ করেনি। ছোট্ট পানির ধারা উপর থেকে নিচে পড়ছে। নিচে গর্তমতো হয়েছে। গর্তভরতি ঘোলা পানি। জলপ্রপাতের একটি জিনিস আমার ভালো লাগল—পানির ধারার চারদিকে সূক্ষ্ম জলচূর্ণের জন্যে অসংখ্য রামধনু দেখা যায়। আমি রামধনু সম্পর্কেই লিখলাম। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে—ষষ্ঠ শ্রেণীর একটি বালকের সেই লেখা পড়ে আমার সাহিত্যিক বাবা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শুধু মুগ্ধ না—প্রায় অভিভূত হবার মতো অবস্থা।

জলপ্রপাতবিষয়ক রচনার কারণে উপহার পেলাম—রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'। গল্পগুচ্ছের প্রথম যে-গল্পটি পড়ি তার নাম 'মেঘ ও রৌদ্র'। পড়া শেষ করে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। তারপর চোখ মুছে আবার গোড়া থেকে পড়া শুরু করলাম। আমার নেশা ধরে গেল।

বান্দরবন পুলিশ লাইব্রেরিতে অনেক বই।

বাবা সেই লাইব্রেরির সেক্রেটারি। রোজ বই নিয়ে আসেন। আমি সারাদিন পড়ি। মাঝে মাঝে অসহ্য মাথার যন্ত্রণা হয়। সেই যন্ত্রণা নিয়েও পড়ি। বিকেলে শঙ্খনদীর তীরে বেড়াতে যাই।

নদীর তীরেই আমার পরিচয় হল নিশাদাদার সঙ্গে। তাঁর ভালো নাম নিশানাথ ভট্টাচার্য, তাঁর বাবা পুলিশের এ.এস.আই.। নিশাদাদা বিরাট জোয়ান। কয়েকবার ম্যাট্রিক দিয়েছেন—পাশ করতে পারেননি। পড়াশোনায় তাঁর কোনো মন নেই, তাঁর মন শরীরচর্চায়। নদীর তীরে তিনি ঘণ্টাখানিক দৌড়ান। ডন-বৈঠক করেন। শেষ পর্যায়ে সারা গায়ে ভেজা বালি মেখে নদীর তীরে শুয়ে থাকেন। এতে নাকি রক্ত ঠাণ্ডা হয়। রক্ত ঠাণ্ডা হওয়া শরীরের জন্য ভালো।

স্বাস্থ্যরক্ষার নানান উপদেশ তিনি আমাকেও দেন। কথায়-কথায় বলেন—Health is wealth. বুঝলে হুমায়ূন, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাঁর সঙ্গে যে-কোনো গল্প করলেই তিনি কীভাবে জানি সেই গল্প স্বাস্থ্যরক্ষায় নিয়ে যান। আমার বড় মজা লাগে।

তখন ঘোর বর্ষা।

বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্ত। নিশাদাদা ভিজতে ভিজতে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। আমার মাকে ডেকে বললেন, মাসিমা, মাছ ধরতে যাচ্ছি। খেপজালে মাছ ধরব। হুমায়ূনকে নিয়ে যাচ্ছি। একা একা মাছ ধরতে ভালো লাগে না। দর্শক ছাড়া মাছ ধরা যায় না। ছাতা দিয়ে দিন। ছাতা থাকলে বৃষ্টিতে ভিজবে না।

নিশাদাদার সঙ্গে ছাতা-মাথায় আমিও রওনা হলাম। নদীর তীরে এসে মুখ শুকিয়ে গেল। বর্ষার পানিতে শঙ্খনদী ফুলেফেঁপে উঠেছে। তীব্র স্রোত। বড় বড় গাছের গুঁড়ি ভেসে আসছে। এই শঙ্খনদী আগের ছোট্ট পাহাড়ি নদী না—এই নদী মূর্তিমতী রাক্ষুসী।

নিশাদাদা জাল ফেললেন। কী যেন ঘটে গেল। শঙ্খনদী যেন তার হাত বাড়িয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে নিল। একবারের জন্যও তার মাথা ভেসে উঠল না। আমি ছুটতে ছুটতে চিৎকার করতে করতে বাসায় ফিরলাম।

নিশাদাদার লাশ পাওয়া গেল সন্ধ্যায়। সাত মাইল ভাটিতে। আমার সমস্ত পৃথিবী উলটপালট হয়ে গেল। পরের অবিশ্বাস্য ঘটনাটি লিখতে সংকোচ লাগছে, না লিখেও পারছি না।

সেই রাতের ঘটনা।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বাবা মাত্র শশ্মান থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে বসেছেন। মা জেগে আছেন। পুরো ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁরা দুজনই আচ্ছন্ন। হঠাৎ তাঁদের কাছে মনে হল কে যেন বারান্দায় হেঁটে হেঁটে আসছে। আমাদের ঘরের সামনে এসে পদশব্দ থেমে গেল। অবিকল নিশাদাদার গলায় কে যেন বলল, হুমায়ূনের খোঁজে এসেছি। হুমায়ূন কি ফিরেছে?

বাবা তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে বের হলেন। চারদিকে ফকফকা জোছনা। কোথাও কেউ নেই।

এই ঘটনার নিশ্চয়ই কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা আছে। বাবা-মা দুজনেই ঐ রাতে একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। অবচেতন মনে ছিল মৃত ছেলেটি। তাঁরা একধরনের অডিটরি হ্যালুসিনেশনের শিকার হয়েছেন। এই তো ব্যাখ্যা।

আমি নিজেও এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছি। তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্য ব্যাখ্যাটিই-বা খারাপ কী? একজন মৃত মানুষ আমার প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে ছুটে এসেছে অশরীরী জগৎ থেকে। উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করছে—হুমায়ূন কি ফিরেছে?

আমার শৈশব কেটে গেল মানুষের ভালোবাসা পেয়ে পেয়ে।

কী অসীম সৌভাগ্য নিয়েই-না আমি এই পৃথিবীতে জন্মেছি!

নিশাদাদার মৃত্যুর পরপর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শিশুমন মৃত্যুর এই চাপ সহ্য করতে পারল না। প্রচণ্ড জ্বরে আচ্ছন্ন থেকে কয়েকদিন কেটে গেল। মাঝে মাঝে মনে হত আমি শূন্যে ভাসছি। শরীরটা হয়ে গেছে পাখির পালকের মতো। সারাক্ষণ একটা ঘোর-ঘোর অবস্থা। এই ঘোরের মধ্যেই আমাকে দেখতে এল

মুরং রাজার মেয়ে। সহপাঠী রাজকন্যা। আচ্ছন্ন অবস্থায় তাকে সেদিন আরও সুন্দর মনে হল। পৃথিবীর সমস্ত রূপ যেন সে তার শরীরে ধারণ করেছে।

সে অনেক কথাই বলল। তার কিছুই আমার মনে নেই, শুধু মনে আছে, একসময় মাথা দোলাতে দোলাতে বলছে—তুমি এত পাগল কেন?

তার এই সামান্য কথা—কী যে ভালো লাগল! সেই ভালোলাগায় একধরনের কষ্টও মিশে ছিল। যে কষ্টের জন্ম এই পৃথিবীতে নয়—অন্য কোনো অজানা ভুবনে।

আমার শৈশবটা কেটে গেছে দুঃখমেশানো আনন্দে-আনন্দে। যতই দিন যাচ্ছে সেই আনন্দের পরিমাণ কমে আসছে। আমি জানি, একসময় আমার সমস্ত পৃথিবী দুঃখময় হয়ে উঠবে। তখন যাত্রা করব অন্য ভুবনে, যেখানে যাবতীয় আনন্দ-বেদনার জন্ম।

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে সিলেটের মীরাবাজারের বাসায় এক গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, দেখি মশারির ভেতর ঠিক আমার চোখের সামনে আলোর একটা ফুল ফুটে আছে। বিস্ময়, ভয় ও আনন্দে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—এটা কী, ?

বাবা জেগে উঠলেন, মা জাগলেন, ভাইবোনেরা জাগল। বাবা আমার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, জোছনার আলো ঘরের ভেন্টিলেটর দিয়ে মশারির গায়ে পড়েছে। ভেন্টিলেটরটা ফুলের মতো নকশা-কাটা। কাজেই তোমার কাছে মনে হচ্ছে মশারির ভেতর আলোর ফুল। ভয়ের কিছুই নেই, হাত বাড়িয়ে ফুলটা ধরো।

আমি হাত বাড়াতেই সেই আলোর ফুল আমার হাতে উঠে এল, কিন্তু ধরা পড়ল না। বাকি রাতটা আমার নির্ঘুম কাটল। কতবার সেই ফুল ধরতে চেষ্টা করলাম—পারলাম না। সৌন্দর্যকে ধরতে না-পারার বেদনায় কাটল আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন। আমি জানি সম্ভব না, তবু এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি যদি একবার জোছনার ফুল ধরতে পারি—মাত্র একবার। এই পৃথিবীর কাছে আমার এর চেয়ে বেশি কিছু চাইবার নেই।

---